শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩৩১

মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রকাশক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ,

২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কলিকাতা,

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

নিউ সরস্বতী প্রেসে

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উপহার
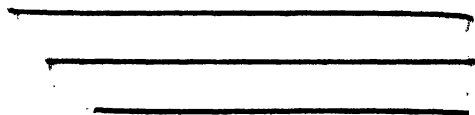
শান্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অকূল পাথারে

হরনাথের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়স ত্রিশ বর্ষের অধিক হইবে না। সে পাটের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু একবার সিরাজগঞ্জে পাট কিনিতে গিয়া তাহাকে যে ম্যালেরিয়ায় ধরিল, তাহা আর ছাড়িল না। এক বৎসর ভুগিয়া সে, তাহার স্ত্রী উমাকে ও একমাত্র নবমবর্ষীয়া কন্যা শান্তিকে রাখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছায়, ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হরনাথ যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল সে সমস্তই তাহার চিকিৎসায় উমা অকাতরে ব্যয় করিয়া ফেলিল এবং হরনাথের পৈত্রিক যে জমিজমা ছিল তাহার অধিকাংশই হরনাথের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভর্জ্জহরি মণ্ডল বৎসরদ্বয়ের মধ্যে বাকী-খাজনার নিলামে তুলিয়া নিজের ভাগিনেয়র নামে ডাকিয়া লইল। উমা পতিশোকে দুই বৎসর

সংসারের কিছুই দেখে নাই, শেষে যখন তাহার চক্ষু ফুটিল এবং সে ভজহরিকে বিদায় দিল, তখন সে নিজে মরণাপন্না। যে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া হরনাথের মৃত্যু হইয়াছিল সেই কাল ব্যাধিই উমাকেও ধরিয়াছিল।

উমা প্রথমাবস্থায় পীড়াকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল এবং গোপনে রাখিয়াছিল। শেষে যখন উমার পীড়ার কথা জানিতে পারিয়া, পার্শ্বের বাড়ীর গৃহিণী যোগমায়া তাঁহার স্বামী কৈলাসচন্দ্রের নিকট সে কথা জ্ঞাপন করিলেন, তখন রোগ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কৈলাসচন্দ্র হরনাথকে জীবিতকালে অনুজের মত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তিনি উমাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু উমা সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল, স্বামীর বাস্তুভিটা ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবে না—মরিতে হয় সেইখানেই মরিবে। অগত্যা কৈলাসচন্দ্র স্বগ্রাম হরিহরপুরের প্রধান ডাক্তার নিতাই মল্লিককে ডাকিলেন, এবং কিছুদিন পরে সদর হইতে সিভিল সার্জ্জনকেও আনিলেন। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল—শেষে উমাকে উত্থানশক্তিরহিত করিল। একদিন অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় সমস্ত দিনমান জ্বরভোগের পর জ্বর ছাড়িয়া গেলে উমা চাহিয়া দেখে সন্ধ্যা হইয়াছে—শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া যোগমায়া তাহার উত্তপ্ত ললাট-দেশ জলসিক্ত করিয়া দিতেছেন। সে ধীরে ধীরে যোগমায়াকে বলিল, "দিদি, তুমি এখনও বসে আছ? আজ যে শনিবার

—ভাসুরের বাড়ী আসবার সময় হ'য়ে গেছে, তুমি বাড়ী যাও নি ?"

যোগমায়া দুঃখিত স্বরে উত্তর দিলেন, "যা'ব কি বোন, আজ কি আর সমস্ত দিন তোমার জ্ঞান ছিল। তিনি এসেছেন—রমেশেরও আজ আসবার কথা আছে। রমেশের দেরী হচ্ছে দেখে তিনি সুদর্শনকে দিয়ে ডাক্তার বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ডাক্তার আসুন, কি বলেন শুনে যাই।"

উমা কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে যোগমায়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "দিদি, আমিত চল্লুম। আমার শান্তি রইল—ওকে দেখ।" এই কয়টী কথা বলিতে উমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল—তাহার বিশীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। যোগমায়া নিজের অঞ্চল দিয়া সস্নেহে উমার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "ওকি কথা বোন ? সেরে যাবে—ভয় কি। জ্বর কি আর কা'রো হয় না ?"

উমা বলিল, "না দিদি—আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার এ জ্বর সারবার নয়। আর আমার মত অভাগীর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি দিদি ? সেজন্যে ভাবছি না—কেবল শান্তির আমার কোনও কিনারা করে যেতে পারলুম না—এই যা ভাবনা ; বাছা আমার অনাথা———"

উমা আর কিছু বলিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় জলভারাক্রান্ত হইল। যোগমায়া ব্যগ্র হইয়া

পুনর্ব্বার স্বীয় অঞ্চল দ্বারা উমার অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছি বোন! অমন করে কাঁদতে আছে কি? জ্বর বাড়বে যে। আর শান্তির জন্যেই বা তোমার ভাবনা কেন? শান্তিকে ত তুমি আমাকে অনেক দিন দিয়েছ। তোমার শান্তিও যে আমার সুধাও সে—তা কি তুমি জান না?"

ঘনমেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেন একবার সূর্য্যের আভা ফুটিয়া উঠিল। যোগমায়ার আশ্বাসবাক্যে উমার মলিন মুখ প্রসন্ন হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি, সে কথা যে তুমি নিজে বল্‌লে, তা'তে আমার বুক থেকে যেন একখানা ভারি পাথর নেমে গেল। সে কথা তুমি না পাড়্‌লে আমার বল্‌তে সাহস হ'ত না। তোমার রমেশের সঙ্গে যখন আমার শান্তির বিয়ের কথা হয়, তখন ত আমার কপাল পোড়েনি—তিনি রোজগার করছিলেন—ধূলো মুঠো ধরলে সোণা মুঠো হচ্ছিল। তোমার রমেশও তখন দুধের ছেলে। তার পর এই তিন চার বছরে কি সর্ব্বনাশই আমার হয়ে গেল। তিনিও গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মীও যেন উড়েপুড়ে গেল। এখন তোমার সোণার চাঁদ রমেশ তিনটে পাশ করে জলপানি পাচ্ছে। ভাসুরও এখন আপিসের মুৎসুদ্দি হয়েছেন, মান-সম্ভ্রম বেড়েছে। এখন তোমরা ইচ্ছে কর্‌লেই রমেশের বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে কত টাকা পেতে পার।"

উমার কথায় সঙ্কুচিতা হইয়া, তাহার বাক্যে বাধা দিয়া, যোগমায়া বলিলেন, "ছি বোন, অমন কথা মুখেও এনো না।

দেওর আমার স্বর্গে গেছেন—তাঁর সঙ্গে [illegible] রেখেছেন যে, শান্তি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী ঘরেই থাকবে—সে সত্যি কি পয়সার লোভে আমরা ভাঙ্গব ? রমেশ আমার বেঁচে থাক—আমার হাতের নোয়া বজায় থাক, অমন টাকায় আমাদের কাজ নেই ভাই। হরি যেন আমাদের অমন মতিগতি না দেন।"

সেই কথা শুনিয়া উমার পাণ্ডুর আনন পুনরায় উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। সে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তোমার এ কথার পর আমি আর কি বলব দিদি। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

উমার কথা শেষ হইতে না হইতে দুইটি বালিকা চঞ্চল-চরণে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একজন যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, কে এসেছে বল দেখি ?"

যোগমায়া—"কে এসেছে সুধা, রমেশ বুঝি ?"

সুধার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অপর বালিকা উত্তর দিল— "হ্যাঁ গো জ্যাঠাই মা, এই দেখ না আমার জন্যে কেমন ছবি দেওয়া রামায়ণ এনেছেন।"

সুধা বলিল, "ঠিক ঐ রকম বই আমার জন্যেও এনেছেন —না শান্তি ? আবার বলেছেন, এবার যদি আমরা ভাল করে পড়া বলতে পারি, তা হলে আসছে বারে কলকেতা

থেকে আসবার সময় আমাদের এক এক খানা ভাল ছবিওলা মহাভারত এনে দেবেন।”

যোগমায়া—“আচ্ছা মা যাও, দুজনে এখন ওবাড়ীতে যাও —আমিও এখনি যাচ্ছি। ঐ বুঝি ডাক্তার বাবু আসছেন।”

সুধা ও শান্তি সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেই ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসচন্দ্র আসিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া যোগমায়া শয্যার পার্শ্ব হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। রমেশও সেই সময়ে আসিয়া তাহার মাতার নিকটে দাঁড়াইল এবং তাঁহার নিকট হইতে রোগিণীর অবস্থার কথা অবগত হইয়া ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। ডাক্তার বাবুটি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি, তিনি রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, ‘যখন হাওয়া বদলাতে যেতে রাজি হচ্ছেন না, তখন কবিরাজি কি অন্য কোন রকম চিকিৎসা করান— আমাদের ওষুধে কিছু হচ্ছে না।”

ডাক্তার ‘জবাব’ দিয়া যাইবার পর কৈলাসচন্দ্র কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে হোমিওপ্যাথী, টোট্‌কা প্রভৃতি অনেক রকম চিকিৎসাই উমার হইল, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। আরও দুই মাসকাল রোগের যাতনা ও চিকিৎসার বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া, একদিন যখন রাত্রির জ্যোৎস্না ঊষার অরুণাভায় মিশিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে উমা স্বপ্নাবেশে চীৎকার করিয়া উঠিল—“এসেছ! আমাকে নিতে এসেছ? এই যে যাচ্ছি!”

প্রাচীনা দাসী রামের মা সেই শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখে —উমা কাহাকেও কিছু না বলিয়া সতী-স্ত্রীর পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছে ; উমা যেন ঘুমাইয়াছে—তাহার রক্তলেশহীন অধরে পতির সহিত চিরমিলনের হাসির রেখা লাগিয়া রহিয়াছে। রামের মা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার চীৎকারে স্বপ্নোত্থিতা শান্তি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ভীতিবিহ্বলনেত্রে একবার তাহার মাতার মরণাহত মুখের দিকে চাহিয়া 'মা মা' করিয়া ভগ্নস্বরে ডাকিল। উমার কোনও সাড়া না পাইয়া একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি শান্তির কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইল এবং সে তাহার মাতার হিমশীতলনিস্পন্দ বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্নেহ-ক্রোড়ে

উমার মৃত্যুর পর শান্তি যোগমায়ার কাছেই থাকে। রামের মা হরনাথের বাটির রক্ষণাবেক্ষণ করে, শূন্যগৃহে সন্ধ্যা দেয় ও রাত্রে সেইখানে শয়ন করে। দিবাভাগে সে কৈলাসচন্দ্রের বাটিতে কাজকর্ম্ম ও আহারাদি করে। যোগমায়া তাহাকেও আত্ম-পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। উভয় বাটির মধ্যে যাতায়াত করিবার একটি দ্বার ছিল—রামের মা এক্ষণে সেই দ্বার মুক্ত রাখিয়া দুইখানি বাটিই যেন এক করিয়া লইয়াছে। শান্তি শৈশবকাল হইতে সেই দ্বার দিয়া আসিয়া কৈলাসচন্দ্রের বাটিতেই দিবসের অধিকাংশ সময় সুধার সঙ্গে খেলা করিয়া কাটাইত, কেবল ক্ষুধা ও নিদ্রার সময় মাতার কাছে ছুটিয়া যাইত। এক্ষণে কেবল সেই দণ্ডে দণ্ডে মাতার কাছে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই সামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছে—কিন্তু সেই প্রভেদটুকুর কারণ যে কি গভীর—কত মর্ম্মান্তিক তাহা শান্তি বুঝিতে পারিয়াছে। তাই তাহার স্বভাবেও একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাহার সেই সদা হাস্যময়ী চপলতা কে যেন কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। মাতৃহারার যে কি অসুখ তাহা শান্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু যোগমায়ার অপার যত্ন ও স্নেহ তাহাকে একদিনের তরেও জানিতে দেয় নাই যে সে নিরাশ্রয়া।

যোগমায়া শান্তিকে নিজ ক্রোড়ের কাছে লইয়া শয়ন করেন এবং শান্তি একদণ্ড চোখের আড়াল হইলে অস্থির হইয়া উঠেন, পাছে শান্তি কাঁদে। সুধা বুঝিতে পারে যে, শান্তি তাহার মাতৃ-স্নেহের কতখানি অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু সুধা তাহাতে অসুখী নহে। যদি শান্তি তাহার 'পিঠপিঠি' সহোদরা হইত তাহা হইলে বুঝিবা উভয়ের মধ্যে একটা ঈর্ষার অন্তরাল আসিত। কিন্তু সুধা জানে তাহার শৈশব-সহচরী প্রাণের শান্তি আজ মাতৃহারা—নিঃসহায়া, সেইজন্য শান্তির দুঃখে সুধারও হৃদয় বিগলিত। সুধা শান্তির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিত এবং শান্তির চক্ষে জল দেখিলে সুধাও তাহার ওবাড়ীর কাকীমার জন্য কাঁদিয়া ফেলিত। কৈলাশচন্দ্রও শান্তি বলিতে অজ্ঞান হইতেন। তিনি শান্তির কাজ কর্ম্ম, লেখা পড়া, বুদ্ধি-বিবেচনা সমস্তই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিতেন—তাহাকে তিনি 'মা লক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শান্তির কথা তাঁহার নিকট কেহ উত্থাপন করিলে তাঁহার মুখে শান্তির প্রশংসা ধরিত না। সে প্রশংসায় সুধাও সুখী হইত কারণ সে নিজেও সুবুদ্ধিমতী,এবং শান্তিকে সে প্রাণের মত ভালবাসিত। কিন্তু সে রঙ্গপ্রিয়া ছিল বলিয়া সময়ে সময়ে অভিমানের সুর ধরিয়া তাহার পিতাকে অপ্রতিভ এবং শান্তিকে নিজের সুখ্যাতি শ্রবণে সঙ্কুচিতা করিয়া যথেষ্ট কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করিত।

একদিন কৈলাসচন্দ্রের নিকট যোগমায়া শান্তির সুখ্যাতি

করিয়া বলিতেছিলেন, "সে দিন আমার মাথা ধরেছিল—আমি উঠতেই পারি নি, কিন্তু শান্তি আমার ঘরকন্নার সমস্ত কাজকর্ম্ম এমন থাতভিত করে গুছিয়ে করেছিল, অনেক গিন্নিবান্নিতে তেমন পারে না।"

সেই সময় সুধার সহিত শান্তিকে সেইখানে আসিতে দেখিয়া কৈলাসচন্দ্র শান্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'মা আমার রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

সুধা সেই কথা শুনিয়া কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল, "আর আমি বুঝি দুষ্টু?"

কৈলাসচন্দ্র স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "না, মা, তুমিও আমার লক্ষ্মী, তবে কি না তোমার কাঁধে এক একবার দুষ্টু সরস্বতী এসে চাপেন।"

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার কাঁধে! কবে?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "কেন, এই সে দিন তোমায় আমার মাথার পাকা চুল তুলে দিতে বল্লুম, তুমি এক মিনিট না যেতে-যেতে যেমন দেখলে সুদর্শন ছিপ নিয়ে খিড়কির পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে অমনি ছুটে পালিয়ে গেলে। তারপর 'মা লক্ষ্মী আমার এসে যতক্ষণ না ঘুমুলুম ততক্ষণ বসে বসে পাকা চুল তুলে দিলে।"

সুধা বলিল, "তা বাপু পাকা চুল তুলতে বড় বেজার ধরে। শান্তি ওসব পারে, আমার তা ভাল লাগে না, কি করব।"

কৈলাসচন্দ্র সস্মিতবদনে উত্তর দিলেন, "সেই কথাই বলছিলুম মা, নইলে তুমিও আমার খুব লক্ষ্মী।"

কৈলাসচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া আত্মপ্রশংসায় লজ্জিতা শান্তি, সঙ্কোচ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে সুধাকে একান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া আবেগভরে বলিল, "সত্যি সুধা তোর মতন লক্ষ্মী মেয়ে আর কেউ আছে?"

সুধা ভ্রূভঙ্গী করিয়া উত্তর দিল, "দেখ, আবার যদি ওসব কথা বলবি ত সেই যে একদিন দাদার কাঁধে চড়ে আম গাছে উঠেছিলি—সেই সব ছেলেবেলার কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলব।"

শান্তি সেই কথা শুনিয়া দুই করে সুধার মুখ টিপিয়া ধরিল।

শৈশবকাল হইতে শান্তি রমেশের উপর সুধার সহিত সমান ভাবে আবদার উপদ্রব করিত। রমেশের নিকটে উভয়েই পড়া বলিয়া লইত এবং যখন যাহা প্রয়োজন হইত তাহা কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়া দিবার জন্য অসঙ্কোচে আবদার করিত। কলেজের ছুটী হইলে কবে সে বাটীতে আসিয়া থাকিবে, প্রত্যহ তাহার দিন গণিত, এবং বাটীতে আসিলে দুইজনেই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিত। কিন্তু অল্পদিন হইল শান্তি জানিতে পারিয়াছে যে, রমেশের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। সেই দিন হইতে শান্তির মনে একটা লজ্জা আসিয়াছে। পূর্ব্বে সে রমেশের নিকট যে সমস্ত বালিকা-সুলভ চপলতা, অভিমান, আবদার করিত, সেই সকল কথা

এক্ষণে কেহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে সে সরমে সঙ্কুচিতা হইয়া যাইত। সুধা সেই সঙ্কোচ দেখিতে ভালবাসিত বলিয়া মধ্যে মধ্যে শান্তির নিকট সেই সকল কথার উত্থাপন করিয়া কৌতুক দেখিত।

রমেশও মাসদ্বয় মাত্র পূর্ব্বে বাটীতে আসিয়া, শান্তির সহিত যে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছিল। সে সংবাদে রমেশ কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করে নাই। বালককালে শান্তির পিতা যে তাহাকে "জামাই জামাই" বলিয়া আদর করিয়া ডাকিত, সে কথা শান্তির মনে ছিল না—কারণ সে তখন নিতান্ত শিশুমাত্র, কিন্তু রমেশের মনে সে কথা স্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল। সেই কারণেই হয়ত তাহার হৃদয়ে শান্তির প্রতি ভালবাসা তাহার অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেই ভালবাসা যে কত গভীর তাহা এতদিন রমেশ নিজেও বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু এক ঘটক-বিভ্রাটে সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘটকের ভ্রূকুটি

রমেশ যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পায় সেই সময় হইতেই তাহার বিবাহ দিবার জন্য ঘটকেরা আসিয়া কৈলাসচন্দ্রকে উত্যক্ত করিত। কৈলাসচন্দ্র পঠদ্দশায় পুত্রের বিবাহ দিবেন না বলিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু যখন রমেশ ক্রমান্বয়ে এফ·এ, ও বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ বৃত্তি পাইয়া, এম-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইল, তখন ঘটকেরা পুনরায় কৈলাসচন্দ্রের বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিল। একদিন রবিবারে গ্রামের তারিণী ঘটক আসিয়া কৈলাসচন্দ্রকে বলিল, "এই যে মশায়—আজ সাক্ষাৎ পেলুম তবু ভাল, ক দিন এসে খবর নিয়ে যাচ্ছি—কবে আপনি বাড়ী আসবেন। আপনার পুত্রটী ত এবার এম্-এ পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে শুনলুম। এবার পুত্রের বিবাহ দিন না—এখন আর আপত্তি কি?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ, এইবার রমেশের বিয়ে দেব।"

তারিণী ঘটক—"বেশ বেশ। তা হলে একটা ভাল সম্বন্ধ হাতে আছে—পলাশডাঙ্গার জমিদার রেবতীকান্ত বাবুর কন্যা —৭।৮ হাজার টাকা ব্যয় করবেন, আমীর লোক; মস্ত বনিয়াদি ঘর—কুলকর্ম্মে এমন সম্বন্ধ আর সহজে পাবেন না।

রেবতী বাবুও কুলীন—বসু চৌধুরী, আর পর্য্যায় মিলে গেছে—কন্যাটীর ২৫ শের পর্য্যায়।”

কৈলাসচন্দ্র—“তা হলে কি হবে ঘটক ঠাকুর, আমার পুত্রের যে সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে।”

তারিণী ঘটক—“সে কি মশায়! এর মধ্যে কোথায় ঠিক্ করলেন?”

কৈলাসচন্দ্র—“তা জানতেই পারবে—আর একদিন এস তখন বলবো।” এই কথা বলিয়া সেদিন কৈলাসচন্দ্র ঘটক ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

ঘটক ভাবিল, কৈলাস বাবু বিষয়ী লোক—তাহাকে একটা স্তোভবাক্য বলিয়া বিদায় দিলেন—সম্বন্ধ এখনো কোথাও স্থির হয় নাই। সাত আট হাজারেও মন উঠিতেছে না—আর কিছু বেশী রকম দাঁও খুঁজিতেছেন। সে বিষয়ে রেবতীকান্তের সহিত পরামর্শ করিয়া তারিণী ঘটক পুনরায় পরবর্ত্তী রবিবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কৈলাসচন্দ্রকে বলিল, “মশায়, আপনার পুত্রটীর সুখ্যাতি শুনে রেবতীকান্ত বাবুর একান্ত ইচ্ছা যে, আপনার ছেলেটীর সঙ্গেই তার কন্যার বিবাহ দেন—এতে যদি তাঁকে কিছু অধিক ব্যয় করতে হয় তাতেও তিনি রাজি আছেন—তিনি দশ হাজার টাকা অবধি দিতে প্রস্তুত।”

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, “না—না—সেজন্যে নয়—রেবতী বাবুর

যথেষ্ট অনুগ্রহ, তাঁকে ধন্যবাদ দিও—কিন্তু আমার পুত্রের সম্বন্ধ অনেক দিন স্থির হয়ে আছে, সে সম্বন্ধ ভাঙবার উপায় নেই।"

ঘটকের কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। সে অনুমান করিতে পারিল না যে, সে অঞ্চলে এমন অবস্থাপন্ন লোক আর কে আছে যে জমিদার রেবতীকান্তর উপরে দর চড়াইয়া দিয়া বায়না করিয়া রাখিয়াছে! কথাটা ঠিক নহে, ক্রুর আর একটা প্যাঁচ মাত্র, দর উঠাইবার ফিকির। তারিণী ঘটক বলিল, "তা হলে সত্য সত্যই কি সম্বন্ধ পাকা হয়ে গিয়েছে? কোথায় হলো —জান্তে পারি না কি? তা'হলে রেবতীকান্ত বাবুকে গিয়ে বলি—তিনি আর মিথ্যে আশায় আশায় থেকে কষ্ট পান কেন?"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "কেন—তুমি কি জান না যে হরনাথের কন্যার সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে?"

ঘটক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সে কি মশায়, বলেন কি! হরনাথের কন্যা! পাবেন কি?"

কৈলাসচন্দ্র সস্মিতবদনে উত্তর দিলেন, "পাব আবার কি? মেয়েটিকে পাব।"

ঘটক কিয়ৎক্ষণ অপলক নেত্রে কৈলাসচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে স্থির করিতে পারিল না যে, কৈলাসচন্দ্র তাহার সহিত কৌতুক করিতেছেন, না তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছে। সে একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি কি

ক্ষেপেছেন না কি মশায়—আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল-ছেন! আপনাদের মত ঘরে রেবতীকান্ত বাবু কন্যা দিতে চাচ্ছেন, সেটা কোথা ভাগ্য বলে মেনে নেবেন—না সে সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়ে—দশ দশ হাজার টাকা ত্যাগ করে কি না একটা বাপ-মা-মরা হা-ঘরে মেয়ে—"

কৈলাসচন্দ্র বাধাদিয়া বলিলেন,"ঠাকুর আমাকে যা বল্‌ছিলে বল—কিন্তু হরনাথের কন্যার সম্বন্ধে ও সব অন্যায় কথা মুখে এনো না। হরনাথ তার মেয়ের জন্যে মাথা গোঁজবার স্থানও রেখে গেছে—আর অন্ন বস্ত্রের সংস্থানও করে গেছে—আর রূপে গুণে তেমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ; তা ছাড়া হরনাথকে আমি কথা দিয়ে রেখেছি। টাকাটাই কি এত বড় হল ঠাকুর? ন্যায়, ধর্ম্ম, রূপ, গুণ, ভালবাসা এ গুলো কি কিছুই নয়?" এই কথা বলিয়া কৈলাসচন্দ্র আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। শান্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তিনি ঘটকের উপর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

ঘটকও কৈলাসচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বাটীর ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা মশায়, আমিও চল্লুম। কিন্তু আপনি হরনাথের মেয়ের ওজর দেখিয়ে যে রেবতীকান্ত বাবুর কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধর কথাটা গ্রাহ্যর মধ্যেই আনলেন না, সেটা ভাল করলেন না—সে কথা আপনাকে বলে যাচ্ছি। এর জন্যে শেষে পস্তাতে হবে।"

কৈলাসচন্দ্রের পিতার আমলের প্রাচীন ভৃত্য সুদর্শন সেখানে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ ঘটকের সহিত কৈলাসচন্দ্রের কথোপকথন শুনিতেছিল। বাবুর সম্মুখে সে কোনও বাক্যব্যয় করে নাই। কিন্তু আত্মদমন করিতে তাহাকে গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল, কারণ এরূপ বাক্‌বিতণ্ডার স্থলে নীরব থাকা তাহার নিতান্তই স্বভাব-বিরুদ্ধ। বাবু চলিয়া যাইতেই সে আর রসনার কণ্ডূয়ন দমন করিতে পারিল না—সে ঘটককে বলিল, "যাও যাও ঠাকুর—মেজাজ দেখাও কার কাছে? জমিদার বাবু গোঁসা করেন—তাঁকে ঘরের ভাত বেশী করে খেতে বোলো। বাবু ভাল মানুষ তাই, অন্য লোক হলে—"

তারিণী ঘটকের স্বাভাবিক রূক্ষ স্বভাব—রূক্ষতর হইয়া উঠিয়াছিল। সে রোষকম্পিতস্বরে বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কস্ বল্‌ছি—চাকর, চাকরের মত থাক্‌বি—অত লম্বা চওড়া কথা কেন?"

সুদর্শন দমিবার পাত্র নহে, সে উত্তর দিল, "তুমিও ঘটক আছ, ঘটকের মত থাক্‌বে—শাসিয়ে যাও কাকে?"

রমেশ উপরের বৈঠকখানায় বসিয়া পাঠ করিতেছিল—সে তারিণী ঘটকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্রুতপদে নামিয়া আসিল। রমেশকে দেখিয়া তারিণী ঘটক আর বাক্যব্যয় করিল না, কেবল সুদর্শনের উপর রোষকষায়িত লোচনের এক অগ্নিময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। রমেশ

সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি? ঘটক এসেছিল কেন? সুধার সম্বন্ধ এনেছিল বুঝি?"

সুদর্শন বলিল, "সুধার কেন গো—তোমার।"

রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ বাবার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?"

সুদর্শন উত্তর দিল, "তোমারই সম্বন্ধের কথা।"

রমেশ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার!—আমার আবার সম্বন্ধ কিরে?"

রমেশের অবস্থা দেখিয়া সুদর্শনের মনে ঘটকের উপর যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা উধাও হইয়া গেল, সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভয় নেই গো খোকা বাবু—বাবু তাকে ভাগিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, সে সব হবে না—তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

রমেশ হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "তাই বল।"

রমেশের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া সুদর্শন বিলক্ষণ কৌতুক অনুভব করিল। সে তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর গিয়া যোগমায়াকে বলিল, "ওগো মা ঠাকরুণ, শীগ্‌গির করে শান্তি দিদির সঙ্গে খোকা বাবুর বিয়েটা দিয়ে ফেল গো। ঘটক তাঁর সম্বন্ধ এনেছে শুনে খোকা বাবু যেন আঁৎকে উঠেছিল—আমি ত তাঁর রকম সকম দেখে, হেসে আর বাঁচিনে।"

সেখানে সুধা ও শান্তি উভয়েই ছিল। সুদর্শনের কথা শুনিয়া সুধা হাসিয়া উঠিল—শান্তি সরমে যেন এতটুকু হইয়া

গেল। যোগমায়া মনে মনে প্রীতা হইলেন, কিন্তু শান্তির সঙ্কোচ দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থা করিবার জন্য বলিলেন, "তার আর হাসি কি বাছা। সুধার আমার একটা সম্বন্ধ ঠিক করতে পারলেই দুইজনেরই এক সঙ্গে বিয়ে দেব।"

সুদর্শন বলিল, "তা হলেই ত ভাল হয়, এক সঙ্গে দুটো যজ্ঞিব খাওয়া খাই। কেমন গো সুধা দিদি?"

এইবার সুধার সঙ্কোচের পালা আসিল—সে লজ্জিতা হইয়া শান্তিকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চল ভাই, আমরা এখান থেকে যাই, সুদর্শন দা' ভারি দুষ্টু।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রজাপতির শুভদৃষ্টি

রমেশের সহিত তাহার সহপাঠী বসন্তের হরিহর আত্মা। উভয়ে চতুর্থ শ্রেণী হইতে হিন্দুস্কুলে একত্রে পাঠ করিত। বসন্তের পিতা গৌরমোহন সিংহ জনৈক ইংরাজ বণিকের অংশীদার এবং কলিকাতায় একজন বনিয়াদি ধনাঢ্য ব্যক্তি। কৈলাসচন্দ্রের বাসা গৌরমোহন বাবুর বাটীর নিকট ছিল। রমেশ পিতার নিকট কলিকাতার বাসাতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত এবং শনিবারে ও ছুটিতে পিতার সহিত দেশে যাইত। বসন্তের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় রমেশ স্কুলের ফেরত প্রত্যহই প্রায় বসন্তের সঙ্গে তাহাদের বাটীতে যাইত। গৌরমোহন বাবুর গৃহিণী প্রভাবতী রমেশকে পুত্রের মতন স্নেহ করিতেন। রমেশের মুখে প্রভাবতী রমেশের পিতামাতার আত্মীয়-স্বজনের ও বাটীর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন এবং গৌরমোহন বাবুর সহিত কৈলাসচন্দ্রের পরিচয় না থাকিলেও উভয়ের পুত্রের মুখে পরস্পরের কথা অবগত হইয়া এবং সওদাগরী নহলে উভয়ে উভয়ের প্রশংসা শুনিয়া পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেইজন্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পর ছুটীতে রমেশের দেশের বাটীতে বেড়াইতে যাইবার জন্য বসন্ত

আবদার করিলে গৌরমোহন বাবু বা প্রভাবতী কেহই আপত্তি করেন নাই।

রমেশের বাটীতে বেড়াইতে গিয়া বসন্ত দুই দিনেই তাহাদের নিতান্তই আপনার হইয়া পড়িল। তখন জ্যৈষ্ঠমাস —কৈলাসচন্দ্রের বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নবপত্রকিশলয়ের শ্যামল শোভায়, মল্লিকা চম্পকের আকুল সৌরভে, দোয়েল কোকিলের ষড়জ পঞ্চমে, প্রকৃতির বসন্তোৎসবে হরিহরপুর মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাগানের গাছের আম পাড়িয়া, বৃক্ষকোটর হইতে শালিকের বৈশাখী শাবক আনিয়া খাঁচায় পুরিয়া, খিড়কির পুষ্করিণীতে ছিপে করিয়া মৎস্য ধরিয়া রমেশ, শান্তি ও সুধার সানন্দ সাহচর্য্যে, বসন্ত, পিঞ্জর-মুক্ত বিহগের ন্যায় দুই দিন আনন্দে কাটাইয়া দিল। বিদায়ের সময় যোগমায়া বলিলেন, "বাবা, দুদিন এসে কেবল কাঁদিয়ে গেলে বৈত নয়। আবার ছুটী হলে এসো—লক্ষ্মীটী আমার।" সুধা ও শান্তির দুই দিন কি আনন্দে কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছিল তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। তাহারাও ছল-ছলনেত্রে দাঁড়াইয়া সেই বিদায় গ্রহণের দৃশ্য দেখিতেছিল—বসন্ত তাহাদের তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "আবার আসবো বই কি—এবার তোমাদের জন্যে কেমন খাঁচা করে কেনেরি পাখী নিয়ে আসব, দেখো।" তাহার পর কলেজের অবকাশের সময় বসন্ত বৎসরে দুই তিন বার রমেশের সঙ্গে তাহাদের দেশে আসিয়া কয়েকদিন করিয়া

থাকিয়া যাইত। প্রতিবারই বসন্ত, সুধা ও শান্তির জন্য, খেলানা, পুতুল, পশম ও রেশম বুনিবার দ্রব্যসামগ্রী, পুস্তক প্রভৃতি কিছু না কিছু আনিয়া তাহাদের উপহার দিয়া যাইত। যোগমায়াও বসন্তের সঙ্গে তাঁহাদের বাগানের ফলমূল, পুষ্করিণীর মৎস্য, স্বহস্তে প্রস্তুত চন্দ্রপুলী, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি কোনও না কোনও দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। বসন্ত তাঁহার রমেশের মতনই আদরের হইয়া উঠিয়াছিল। বসন্ত আসিয়া রমেশের সহিত, সুধা ও শান্তির পাঠের ও হস্তলিখনের পরীক্ষা লইত এবং তাহাদের সূচী ও শিল্পকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া উৎসাহ দিত।

এম্-এ পরীক্ষা দিবার পর যেবার বসন্ত রমেশদের দেশে আসিল, সেবার সুধা ও শান্তির সূচী ও শিল্প কর্ম্ম দেখিতে চাহিলে—উভয়েই তাহাদের নিজ হস্তে বোনা লেশ দেওয়া কয়েকটী জ্যাকেট ও সেমিজ আনিয়া বসন্তকে দেখাইতেছিল—এমন সময় রমেশ সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই শান্তি সলজ্জভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। তাহা দেখিয়া বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তি পালা'ল কেন?"

সুধা অসঙ্কোচে উত্তর দিল, "তা বুঝি জানেন না, দাদার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে কি না—তাই দাদাকে দেখে ওর লজ্জা হল।" সেই সুখবর দিতে সুধার মনের আনন্দ অধরোষ্ঠে হাসির রেখায় ফুটিয়া উঠিল।

বসন্ত পূর্ব্বেই রমেশের নিকট সেই সুসংবাদের ইঙ্গিত পাইয়াছিল, সে সস্মিতবদনে বলিল, "তা ত শুনেছি—আর সে ত অনেক দিনের পুরাণো কথা; সেজন্যে এতদিন পরে লজ্জা হ'ল বুঝি?"

সুধা বলিল, "সে ছেলেবেলার কথা—আমরা ত কেউ জানতুম না; শান্তিরও মনে ছিল না—এই সেদিন সবে বাবা আর মা সে কথা সকলকে জানিয়েছেন কি না—তাই শান্তির লজ্জা হয়েছে।"

বসন্ত বলিল, "তার আবার লজ্জা কি? রমেশ কি অচেনা লোক, যে লজ্জা হবে? এই মনে কর না কেন—আমার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হয় তা হ'লে কি তুমি আর আমার সুমুখে বেরুবে না—না আমার সঙ্গে এখনকার মতন কথা কইতে লজ্জা কর্‌বে?"

বসন্ত সেই কথাগুলি হাসিতে হাসিতে রহস্যচ্ছলে বলিয়া, মনে করিল, যে পূর্ব্বে যেমন রহস্য করিলে সুধা কখন কখন রাগ করিত, এখনও সেইরূপ অভিমান করিয়া বলিবে "যান যান, আপনার সঙ্গে আড়ি।" কিন্তু সুধার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বসন্ত তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। বসন্ত দেখিল, সুধার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে—সে চকিতের মত একবার করুণকটাক্ষে বসন্তের দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে ও নীরবে, সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সেই বেদনা ও ভৎর্সনামিশ্রিত মৌন দৃষ্টিতে বসন্ত অপ্রতিভ ও অনুতপ্ত

হইয়া কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। রমেশ বলিল, "কথাটা বলে ভাল করনি—এখন আর কি সুধা সেই ছেলেমানুষটী আছে যে তোমার ও সব ঠাট্টা শুনে হেসে উড়িয়ে দেবে?"

বসন্ত ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "ঠাট্টা নয় হে—সত্যি কথাই বলেছি, আমার সঙ্গে সুধার বিয়ে দিতে তোমাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

রমেশ বলিল, "আমাদের আপত্তি! তোমার বাবা রাজি হবেন কেন? নইলে মা ত অনেকদিন আমাকে সে কথা বলেছিলেন—আমি বল্লুম, তা কি হয়?"

বসন্ত বলিল, "হবে না ই বা কেন শুনি?"

রমেশ বলিল, "তোমরা হলে বড়লোক—তোমার বাবা, মা সবাই যেন আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, কিন্তু তা ব'লে আমি কি আমাদের মত ঘরে তোমার বিয়ে দেবার কথা বল্‌তে পারি—তুমি কলকাতার সেরা বড় লোকের ঘরে বিয়ে করতে পার।"

বসন্ত বলিল, "যাও যাও, আর জ্যাঠামো করো না—কেন মিছি মিছি আপনাদের খাটো কর? বল দেখি তোমাদের মত এমন সৎসংসার ক'জন বড়লোকের আছে? তোমার বাবার মত সজ্জন, অমায়িক ভদ্রলোক ক'টা দেখতে পাও? সে যাক্‌গে—আমি অনেক দিন থেকে ভেবে-চিন্তে ঠিক করে দেখেছি—বিয়ে যদি করতে হয় ত সুধাকেই বিয়ে করব এবং

তা হ'লে সুখী হতে পারব। এখন তোমাদের যা মত হয় কর।"

রমেশ বলিল, "আমাদের আর মতামত কি? মা শুনলে কত আহ্লাদ করবেন এবং বাবাও কত সুখী হবেন, তা কি আর আমি বুঝতে পারছি না? সুধা যদি তোমার মত বর পায় তা হ'লে তার সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু তোমার বাবা যদি রাজি না হন—আর না হলেও তাঁকে দোষ দিতে পারি না— সেই জন্যে বৃথা আশা দিয়ে মার ও বাবার মিছে মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করি না। কষ্টটা যে খুব বেশী লাগবে তা বেশ বুঝতে পারছি—আর শুধু তাঁদের নয়, সুধার মুখের ভাবটা এখন যা লক্ষ্য করে বঝলুম—তাতে দেখছি ওর পক্ষে সে কষ্টটা বড়ই মর্ম্মান্তিক হবে।"

বসন্ত বলিল, "না না সে সব কিছু ভাবনা নেই। আমি আমার মাকে অনেক দিন আগেই একটু জানিয়ে রেখেছি। বাবাও তোমাদের সকলকে জানেন—তোমার বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করেন, অমত করবেন না তা আমি বেশ জানি। তুমি তোমাদের এখানে বলে রেখ—আমি কাল চলে যাবার পর বলো। তারপর আমার বাবাকে কখন খবর দিতে হবে সে কথা আমি তোমাকে সময় বুঝে জানাবো।"

——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন

পরদিন প্রাতে বসন্ত কলিকাতায় ফিরিলে রমেশ তাহার মাতাকে বলিল, "মা, বসন্তের সঙ্গে সুধার বিয়ে দেবে?"

যোগমায়া বলিল, "সে কথা ত আগেই বলেছিলুম বাবা। তুমি বল্‌লে সে হতে পারে না।"

রমেশ বলিল, "এখন দেখছি—হলেও হতে পারে। বসন্ত তোমাদের মত নিয়ে তার বাপ মাকে জানাতে বলে গেছে।"

যোগমায়া বলিলেন, "আমাদের আবার সে কথা জিজ্ঞেস করছ বাবা? কর্ত্তা শুনলে কত সুখী হবেন তা কি তুমি বুঝতে পারছ না—সুধা আমার তপস্যা করে থাকে ত বসন্তের হাতে পড়বে। হরি করুন, বসন্তের বাপ মা যেন রাজি হন —যেন তাঁরা কোনরকম রাগ দুঃখু না করেন, শেষে বসন্তের আমার যেন এখানে আসা বন্ধ না হয়।"

রমেশ বলিল, "না মা, আমি কি এমন করে বল্‌ব যাতে তাঁরা রাগ করেন—আমি নিজে গিয়ে তাঁদের বল্‌ব"। অবশ্য তাঁরা বড়লোক—বসন্ত নিজে না বল্‌লে আমি একথা পাড়তে পারতুম না। কিন্তু বসন্তের মনের ভাব জানতে পারলে, গৌরমোহন বাবু যে কোনও আপত্তি করবেন, তা বোধ হয় না—তিনি সে রকম লোক নন। বড়লোক বলে যে একটা দেমাক—তা তাঁর একটুও নেই।

যোগমায়া বলিলেন, "তাই হোক বাছা—তুমি হরির ইচ্ছেয় সেই সুখবরই এনে দাও। তা হলে আমিও বাঁচি—শান্তির মার কাছে যে সত্যি করে আছি, তা থেকে মুক্ত হই। কর্ত্তার ইচ্ছে, সুধার বিয়ের একটা ঠিকঠাক না করে তোমার বিয়ে দেবেন না—তাই চুপ করে আছি; এখন সুধার আমার যদি বিয়েটা ঠিক করে আনতে পার—তা হলে এক সঙ্গেই দিনকতক আগে পিছে করে তোমাদের দুজনেরই বিয়ে দিই।"

রমেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "লোকের কন্যাদায়ই হয়, তোমার আবার যে মা তার ওপর পুত্রদায়ও উপস্থিত, তা ত সকলে বুঝবে না—কাজেই অত তাড়া করলে চলবে না মা। বসন্ত বলেছে যে, সে সময় বুঝে আমাকে তার বাপকে ও কথা বল্‌তে বল্‌বে। এখন বোধ হয় গৌরমোহন বাবু বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আছেন। আমি আজই কলকাতা গিয়ে বসন্তের কাছে যাব এখন; কিন্তু এ সপ্তাহে গৌরমোহন বাবুকে বলা হবে কি না তা ঠিক বল্‌তে পারছি না। এখন বাবাকে এ কথা কিছু বলো না—আমি সেখান থেকে আসি, তারপর বলো।"

রমেশ ও কৈলাসচন্দ্র কলিকাতায় আসিলে—যোগমায়া মনের আহ্লাদ গোপন রাখিতে পারিলেন না। বসন্ত যে নিজে সুধাকে পছন্দ করিয়া গিয়াছে, সে আনন্দ তিনি প্রতিবেশিনী আত্মীয়া-স্বজন, দুচক্ষে যাহাকে দেখিলেন,

তাহাকেই বিতরণ করিলেন এবং সকলকেই সে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু সে নিষেধ সত্ত্বেও সুধা ও শান্তির সে কথা শুনিতে বাকি রহিল না।

বৈকালে ছাদের উপর বসিয়া সুধার চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে, সেখানে অপর কেহ নাই দেখিয়া, শান্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে কাল বসন্ত বাবুর কাছ থেকে অমন করে চলে এলি কেন ?"

সুধা প্রথমে সে কথার উত্তর দিতে পারিল না—তাহার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু চকিতে তাহার স্বভাবসিদ্ধ রহস্যপটুতা ফিরিয়া আসিল—সে যেন বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করে ?"

শান্তি বলিল, "আমি যেন দেখিনি, যেন ভিজে বেরালটি হয়ে ?"

সুধা উত্তর করিল—"ও ! সে তোমারই জন্যে। মশায়ের দাদার সুমুখ থেকে পালিয়ে আসা হ'ল কেন, জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেন বলে ?"

শান্তি বলিল, "কে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেন ? বসন্ত বাবু ?"

সুধা বলিল, "তা নয় ত কি দাদা জিজ্ঞেস কর্‌বে ? মেয়ে যেন সং।"

শান্তি সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিল "তাতে মশায়ের লজ্জাটা হ'ল কেন ?"

সুধা বলিল, "লজ্জা হতে যাবে কেন ! আমি বল্‌লুম

শান্তি আজ বাদে কাল আমার বৌদিদি হবে কি না—তাই আগে থাকতে লজ্জা করাটা শিখে রাখছে। নইলে আমি ননদিনী হাজির আছি—এর পর বেহায়া বলে দু'কথা শুনিয়ে দেবো কি না ?"

শান্তি বলিল, "সে কথা শুনে নন্‌দাই মশায় কি বল্‌লেন ?"

সুধা সেই বিদ্রূপে চমকিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া বসিয়া শান্তির মুখ টিপিয়া ধরিল। শান্তি তাহার হস্ত সরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি যেন কিছু শুনিনি ? মশায় কি বলেন তাই দেখছিলুম।"

সুধা শাসাইল, "অমন করলে কিন্তু সেই—সে কথা সকলকে বলে দেব।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

সুধা হাস্যবিকশিত অধরে বলিল, "সেই সে দিন—নতুন গোলাপ গাছের ফুলটা তুলে, দাদা—এদিক্ ওদিক্ চেয়ে তোর মাথায় গুঁজে দিয়ে গেল, আমি বুঝি দেখিনি ? দাদা চলে যেতেই মেয়ের আবার সেই ফুলটা কাপড়ের ভেতর করে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর ফুলদানীতে জল দিয়ে রেখে আসা হল।"

শান্তিও সহাস্যবদনে উত্তর দিল, "আর মশায় যে সেদিন অন্যমনস্ক হয়ে নতুন খাতাখানাতে বসন্ত বাবুর নাম লিখে লিখে হাত পাকিয়ে ফেল্‌লেন। কি লিখ্‌ছিলেন, আমি তা দেখ্‌তে গেলেই—জিভ্‌ কেটে খাতার পাতাখানা টুকরো

টুকরো করে মেয়ের ছিঁড়ে ফেলা হলো। আমি সে কথা বল্‌তে জানিনে?"

সুধা বলিল, আচ্ছা বাপু, শোধবোধ হয়ে গেল। এখন আর কিছু বলাবলিতে কাজ নেই। আগে আমার বৌদিদি হও, তারপর ননদগিন্নি করে তোমাকে কি মজাটা দেখাই দেখো দিখি।" এই বলিয়া সুধা পরম স্নেহভরে শান্তির গলা জড়াইয়া ধরিল।

শান্তি সস্মিতবদনে সুধার চিবুকে হস্ত দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, "তা যাই বল ভাই, বসন্ত বাবু জিতে গেলেন। তাঁরা বড় মানুষ, ঘর-আলো করা বউ আনতে পারতেন; কিন্তু এমন মন-আলো করা বউ কোথায় পেতেন?"

সুধা বলিল, "না! দাদাই যা হেরে গেলেন—না?",

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে হারই হোক আর জিতই হোক—মা বাপ ঠিক করে দিচ্ছেন, তাতে ত আর কথা নেই। আর এ যে স্বয়ম্বর; তা বসন্ত বাবুর পছন্দটার সুখ্যেত করবো না? তা যা হোক এখন আমি আর কিছু বল্‌ছি না—আগে পাকাপাকি হ'ক; তারপর স্বয়ম্বরটা কোন দিক্ থেকে হলো তার তদন্ত করে তবে ছাড়বো।"

সুধা বলিল, "আচ্ছা তা যা ইচ্ছে যায় করবেন মশাই, এখন কাপড় কাচবেন চলুন—এ দিকে যে সন্ধ্যে হয়ে এল।"

নীচে নামিয়া গিয়াও উভয়ে সেই বিবাহের কথা হইতে

নিষ্কৃতি পাইল না—দেখিল রামের মার সহিত সুদর্শনের বিবাদ বাধিয়াছে—যোগমায়ার মধ্যস্থতা করা দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রামের মা বলিতেছে, "আমি খুকিকে মানুষ করেছি—আমি সোণার দানা নেব তবে ছাড়বো।"

সুদর্শন বলিতেছে—"তুই শান্তি দিদিকে মানুষ করেছিস্ আর আমি সুধাকে মানুষ করিনি—খোকা বাবুর দুরন্তপনা সই নি? তুই যদি সোণার দানা পাস্ ত আমিও কি ছেড়ে কথা কইব?"

রামের মা বলিতেছে, "তুই পুরুষমানুষ গয়না পরবি না কি? তুই একখানা পাটের কাপড় নিস্।"

সুদর্শন বলিল, "বা রে! বেশ মজার লোক ত, উনি নেবেন সোণার দানা—আমি নেব পাটের কাপড়!"

যোগমায়া সুদর্শনকে বলিতেছেন, "ঝগড়া করিস্ নি বাপু—হরির ইচ্ছেয় বাছাদের সব ভালয় ভালয় চার হাত এক হয়ে যাক—আমি তোর বৌকে সোণার অনন্ত গড়িয়ে দেব। রামের মাও যেমন শান্তিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—তেমনি আমার রমেশ, সুধা দুজনেই তোর গলার হার, সে কথা কি আমি ভুলবো সুদর্শন? তোদের খুসী আমি আগে করবো।"

সুদর্শন একেবারে জল হইয়া গিয়া বলিল, "আমরা কি তোমাকে জানি না মা-ঠাকরুণ—ঝগড়া করব কেন? বুড়ো দিদির সঙ্গে একটু তামাসা করছিলুম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নারদের মন্ত্রণা

কৈলাসচন্দ্রের বাটী হইতে বিদায় লইয়া তারিণী ঘটক একেবারে জমিদার রেবতীকান্তের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তারিণী অনেক দিন হইতে রেবতীকান্তের কন্যার সহিত কৈলাসচন্দ্রের পুত্রের বিবাহ দিয়া, লোকের কাছে গর্ব্ব করিয়া বলিয়া বেড়াইবার মত একটা 'মোটা' রকম ঘটকালী আদায় করিবার যোগাড়ে ছিল। সে আশায় নিরাশ হইয়া তারিণী কৈলাসচন্দ্রের সহিত তাহার ঐ বিবাহ সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা শাখা-পল্লবিত করিয়া সে রেবতী-কান্তের নিকট জ্ঞাপন করিল, এমন কি সুদর্শন তাহাকে যে দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছিল তাহাও সে দুই-চার পোঁচ রং ফলাইয়া কৈলাসচন্দ্রের মুখে আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। যখন দেখিল যে রেবতীকান্তের অভিমানে আঘাত লাগিয়াছে এবং সে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তারিণী টিপ্পনী কাটিল, "শেষে বল্লে কি জানেন মশায়? দশ হাজার কি, যদি দশ লাখ টাকা দেয় তবু আমি রেবতীকান্তের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেব না—আমি ঐ হরনাথের মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেব—এতে সে রাগ করে, তা'কে ঘরের ভাত বেশী করে খেতে বলো।"

রেবতীকান্ত বলিল, "বটে! কৈলেস ঘোষের এত তেজ

হয়েছে! চাকরী না করলে অন্ন জোটে না—এই ত ক্ষমতা, এতে এত তেজ কিসে হয়?”

তারিণী বলিল “মশায়, কালটা কেমন পড়েছে—এখন আধুনিকদেরই রাজত্ব, যদি আগেকার মত সামাজিক শাসন থাকত তা’হলে কৈলাস বাবুর মত লোকের সাধ্য কি যে আপনাদের মত সমাজপতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। আমারই রাগে গা গর্ গর্ করছে—আপনার মেয়েকে পায়ে ঠেলে কি না হরনাথের মেয়েকে মাথায় করলে, কি স্পর্দ্ধা!”

রেবতীকান্ত বলিল, “ঠাকুর ব্যস্ত হও কেন? হরনাথের মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের বিয়ে দেওয়া আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। কর্ত্তাদের আমলে পলাশডাঙ্গার বাবুদের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত সে কথা শুনেছ ত? রেবতীকান্ত চৌধুরীর সেই বংশে জন্ম, এখনো সে মরেনি এ কথাটা মনে রেখো।”

তারিণী ঘটক দেখিল, ঔষধ ধরিয়াছে—তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। সে বলিল, “তাই যা হয় একটা করুন মশায় —আপনারা হলেন সমাজের মাথা, আপনারা নরম হয়ে আছেন বলেই ত এই সব আধুনিকগুলোর এত বাড় বেড়ে উঠেছে।”

এই কথা বলিয়া তারিণী ঘটক বিদায় হইল। রেবতী-কান্ত কি উপায়ে কৈলাসচন্দ্রের পুত্রের বিবাহ পণ্ড করিয়া দিবে সেই চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। দুই দিন পরিয়া

কয়েকজন বিশ্বস্ত পারিষদের সহিত গভীর মন্ত্রণার পর রেবতী-কান্ত একটা উপায় ঠিক করিল। সে গোবর্দ্ধন দত্তকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

গোবর্দ্ধন দত্ত শান্তির মেসো মহাশয়—উমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্যামার স্বামী। গোবর্দ্ধন যুবা বয়সে উচ্ছৃঙ্খল ছিল এবং তাহার পিতা মোক্তারী কার্য্যে যাহা কিছু সংস্থান করিয়া গিয়াছিল তাহা অল্পদিনেই অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের কুপরামর্শে এবং তাড়নায় বাধ্য হইয়া একবার শ্যামা নিমন্ত্রণ যাইবার ব্যপদেশে উমার সহস্রাধিক টাকার অলঙ্কার চাহিয়া লইয়া গিয়া স্বামীর হস্তে অর্পণ করে। সে গহনা আর উমা ফিরাইয়া পায় নাই। উমার পিতা তখন জীবিত ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠ জামাতার দুষ্কৃতিতে মহা লজ্জিত হইয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, হরনাথের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু হরনাথ তখন যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছিল—সে শ্বশুরের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। সেই ঘটনার পর গোবর্দ্ধন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। তদবধি শ্যামার সহিত উমার কোনও সংস্রব ছিল না। গোবর্দ্ধনের শ্বশুরও যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বা জামাতার কোনও সংবাদ রাখিতেন না। প্রায় দশ বৎসর পরে গোবর্দ্ধন দেশে ফিরিয়াছে। বৎসরেক হইল সে স্বগ্রামের ঘোষালদের যে প্রকাণ্ড তিন মহল ভদ্রাসনবাটী

পড়িয়াছিল, তাহা ক্রয় করিয়া, আমূল সংস্কারে নূতন অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছে এবং সেই বাটীতে দাসদাসী, দ্বারবান, গাড়ী-ঘোড়া রাখিয়া লক্ষপতির চালে বাস করিতেছে। লোকে বলে সে এক্ষণে ৩।৪ লক্ষ টাকার অধিকারী এবং ইহাও রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, সে মধ্যপ্রদেশ হইতে চা-বাগানের কুলি-চালানী ব্যবসায়ে ঐ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে। দুষ্ট লোকে কানাঘুসা করে যে, গোবর্দ্ধন অধিক অর্থোপার্জ্জনের লোভে আইনের চক্ষে ধূলা দিয়া প্রতারণা করিয়া কুলি সংগ্রহ করিত এবং শেষে একটা ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পড়িয়া অর্থবলে আসন্ন কারাবাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, বিলাসপুর হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। সেই কুলী-বেচার অপযশের জন্য দেশে আসিয়া সে বর্দ্ধিষ্ঠ সমাজে একঘরে হইয়া আছে—মাসত্রয় পূর্ব্বে তাহার কন্যার বিবাহের সময় দেশের কোনও বর্দ্ধিষ্ঠ লোক তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নাই—সেই কারণে গোবর্দ্ধনের মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট। জাতিতে উঠিবার জন্য সে অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। গোবর্দ্ধনকে এই সামাজিক দণ্ডবিধান করিবার নেতা ছিল জমিদার রেবতী-কান্ত—ধনে, মানে, বংশ-গৌরবে রেবতীকান্তই পলাসডাঙ্গা অঞ্চলের কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয়; রেবতীকান্তের বাটীতে আসিয়া, তাহাকে অনেক অনুরোধ করিয়া গোবর্দ্ধন হার মানিয়া গিয়াছে। শেষে বাটীতে আসিলে রেবতীকান্ত গোবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎও করিত না। এক্ষণে সেই রেবতী-

তাহাকে উপযাচক হইয়া, স্বহস্তে লিখিত পত্রে সম্মানসূচক সম্বোধন করিয়া, সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছে, দেখিয়া গোবর্দ্ধন কৃতার্থ হইয়া গেল,—কিছু বিস্মিতও হইল।

রেবতীকান্তের বাটীতে উপস্থিত হইলে রেবতীকান্ত তাহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন বাবু, একটা কথা রাখেন ত আপনাকে আমাদের দলে তুলে নিই।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আজ্ঞা করুন, কি কর্‌তে হবে?"

রেবতীকান্ত বলিল, "এমন বেশী কিছু নয়—আমার সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা কর্‌বেন?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "সে ত পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জানেন ত মশায়, আমার বড় কন্যাটীর বিয়ে দিয়েছি—আর সব ছেলে-মেয়েগুলি ছোট। কুটুম্বিতেটা কি করে হবে তা যে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।"

রেবতীকান্ত বলিল, "কেন, হরনাথ বোসের মেয়ে নেই?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও! আমার শালীর মেয়েটীর কথা বলছেন? তাকে ত শুনেছি হরিহরপুরের কৈলাস ঘোষই লালনপালন করছেন—তাঁরই ছেলের সঙ্গে কুলকর্ম্ম করবেন।"

রেবতীকান্ত বলিল, "সেইটেই হ'তে দেওয়া হবে না।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "কেন? ছেলেটী ত শুনেছি অনেক পাশটাস করেছে, খুব সুপাত্র। আর কৈলেস বাবুও না কি বেশ সঙ্গতি করেছেন।"

রেবতীকান্ত বলিল, "কৈলাস ঘোষ ত চাকরী করে দিন গুজরান করে, তার আবার সম্মতি করা কি? আর ছেলেও পাশ করে ত রাজা হবে—নয় উকিল হয়ে যাত্রার দলের জুড়ি সেজে আদালতে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াবে, নয় ত মুন্সেফী নিয়ে কি ডেপুটী হয়ে, সাত ঘাটের জল খেয়ে, হয় ম্যালেরিয়ায় নয় ডায়াবিটিজে ভুগে মরবে। আমি তার চেয়ে ঢের ভাল সম্বন্ধের কথা বল্‌ছি। জমিদারের ছেলে—কখন পরের দাসত্ব করতে হবে না। আমার শালা সুরেশের কথা বল্‌ছি—যে আপনাকে সঙ্গে করে উপরে দিয়ে গেল—দেখেছেন ত কার্ত্তিকের মত চেহারা—আর আমার শ্বশুর মহাশয়দের জানেন ত? তাঁরা হারাণপুরের দেওয়ান বংশ, মকর্দ্দমা-মামলায় এখন অবস্থা পড়ে গেছে; তবু মরা হাতী লাখ্ টাকা। তা ছাড়া সুরেশ আমার এখানেই থাকে, আমার পরিবারই তাকে মানুষ করেছে—বউএর জন্যে আগে থাকতে গহনাপত্র গড়িয়ে রেখেছে, আপনি সেরেফ্ মেয়েটী দেবেন।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "কৈলাস বাবু যদি রাজি না হন?"

রেবতীকান্ত বলিল, "আপনি থাকতে কৈলাস কে? কৈলাসকে কি হরনাথ মরবার সময় তার মেয়ের অভিভাবক করে গিয়েছিল, না হরনাথের পরিবার কিছু লেখাপড়া করে দিয়ে গেছে? মুখের কথার আবার জোর কি? আপনার স্ত্রীই এখন আইন মতেও বটে আর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ হরনাথের কন্যার অভিভাবক। আপনি যদি সে মেয়ের বিয়ে দেন,

কৈলেস ঘোষের সাধ্য কি যে আপনার কথার উপর কথা কয়।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “সে ত পরের কথা মশায়। কৈলাস বাবু যদি আমার কাছে মেয়েকে না পাঠান।”

রেবতীকান্ত বলিল, “বিয়ের কথা বলতে যাবেন কেন? কৌশল করে নিয়ে আসবেন। যে উপায়ে বিষয় সম্পত্তি করেছেন তা' ত কারুর জান্তে বাকি নেই, তখন আর এই সামান্য কাজটায় পেছপাও হচ্ছেন কেন?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আচ্ছা তা যেন হল—মেয়েকে আমার বাড়ীতে এনে বিয়ে দিলাম। কিন্তু পরে এই নিয়ে যদি আইন আদালতের হাঙ্গামা পোয়াতে হয়?”

রেবতীকান্ত বলিল, “সে সব ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আজ বুধবার—তিন দিনের মধ্যে যদি আপনি মেয়েটাকে আপনার বাড়ীতে এনে হাজির করতে পারেন, তা হলে এই রবিবারের লগ্নেই বিয়ে দিয়ে আমি কনে নিয়ে আসব। তারপর ক্ষমতা থাকে কৈলেস আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। আপনার গায়ে আঁচ লাগতে দেবো না।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আচ্ছা মশায়, এ বিষয়ে একটু ভেবে আপনাকে সংবাদ দেবো।”

রেবতীকান্ত বলিল, “ভেবেচিন্তে দেখবার সময় নেই—এই রবিবার এ বছরের শেষ লগ্ন, তার পর চৈত্র মাস পড়ে যাবে; যদি রাজি হন ত আজই খবর দেবেন। পাকা দেখা, আশীর্ব্বাদ-

পত্রটত্র কিছু দরকার নেই—মেয়ে সুশ্রী আমার জানা আছে, আর সুরেশকে ত আপনি দেখেই গেলেন। আমাকে আবার এ দিকের যোগাড়যন্ত্র করতে হবে, শ্বশুর মহাশয়দের আনতে হবে। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, যাতে বরযাত্রী-দের খাওয়া-দাওয়াটা ভাল হয় তার বন্দোবস্ত করুন—আমার আত্মীয় কুটুম্বেরা সব কি দরের লোক তা জানেন ত? আমি তাঁদের সব নিয়ে যাব, আর আপনিও এ অঞ্চলের বড় ঘরোয়ানা যে যেখানে আছে, সব একধার থেকে ঢালা নিমন্ত্রণ করুন—হরিপালের মুন্সীদের, আঁটপুরের চৌধুরীদের, বাদাম-ডাঙ্গার মুস্তফীদের—কাকেও বাদ দেবেন না। আমার শালার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন—দেখব কার মাথার ওপর মাথা আছে আপনার বাড়ীতে পাত না পাড়ে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "যা আজ্ঞা করছেন তাই হবে। আমি মেয়ে আনবার উপায় দেখিগে। যে রকম হয়, আপনাকে খবর পাঠাব।"

গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিবার সময় রেবতীকান্ত পুনরায় শিষ্টাচারের অভিনয় করিল। এমন কি নিজে আসিয়া গোবর্দ্ধনকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল এবং "বাঃ, বেশ ল্যাণ্ডোখানি কিনেছেন ত; জুড়িটার সঙ্গে দিব্য মানিয়েছে!" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে আপ্যায়িত করিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মমতার অভিনয়

গাড়ীতে বসিয়া একটু চিন্তা করিতেই গোবর্দ্ধন বুঝিতে পারিল যে, রেবতীকান্ত কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল—কৈলাসচন্দ্রকে অপদস্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য, নতুবা হরনাথের কন্যার সহিত তাহার শ্যালকের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইবার অপর কোন কারণ সে আবিষ্কার করিতে পারিল না। গোবর্দ্ধন জানিত যে, হরনাথ এমন কিছু বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যায় নাই যাহা হস্তগত করিবার জন্য রেবতীকান্তের লোভ হইতে পারে। গোবর্দ্ধন ভাবিল, কৈলাসচন্দ্রকে অপদস্থ করিয়া যদি রেবতীকান্ত সন্তুষ্ট হয়, হউক—তাহাতে তাহার কি আ'সে যায়। ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া কোন কর্ম্ম করা গোবর্দ্ধনের কোষ্ঠীতে লিখে নাই, এ ক্ষেত্রেও সে সে'দিক দিয়া গেল না। সে যে এইবার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাজে একাসন পাইবে, সেই বাঞ্ছিত আশায় সে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়া গোবর্দ্ধনের বড়লোক বলিয়া গণ্য হইবার সাধটা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তাহাতে তাহার নীরস হৃদয়ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই দুর্ব্বলতার মোহে পড়িয়া ধূর্ত্ত গোবর্দ্ধন নির্ব্বোধের মত নাচিয়া উঠিল।

বাটীতে ফিরিয়া গোবৰ্দ্ধন তাহার স্ত্রী শ্যামার নিকট রেবতীকান্তের সহিত তাহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "এখন তোমার বোনঝিকে আনাও দেখি—তা হলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।"

শ্যামার হৃদয়ের নারীসুলভ কোমলতা অবস্থা-বিভ্রাটে পড়িয়া বরফের মত কঠিন হইয়া গিয়াছিল। শ্যামাকে তাহার পিতা অষ্টম বর্ষে "গৌরী" দান করিয়াছিলেন। শ্যামার বালিকা বয়স, শ্বশুর বাটীতে আবদ্ধা থাকিয়া, মাতা পিতার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়াছিল। শ্যামার যখন স্বামীকে চিনিবার বয়স হইয়াছিল—যখন তাহার নারীত্ব পিপাসিতা চাতকীর মত পতি-সোহাগবারিবিন্দুর তৃষায় হা হা করিয়া উঠিয়াছিল, তখন দুর্দ্দৈবের নির্ম্মম ফুৎকার, বর্ষণোন্মুখ জলদজালকে বারে বারে তাহার মুখের সম্মুখ হইতে দূরে উড়াইয়া দিয়াছিল। সে দুর্দ্দৈব অপর কিছু নহে, শ্যামার শ্বশুরের দুর্ব্বুদ্ধি। শ্যামার বয়ঃসন্ধিকালে গোবৰ্দ্ধনের তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গোবৰ্দ্ধনের পিতা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার বধূমাতাটী মিট্‌মিটে ডাইনী—তাঁহার নন্দদুলাল গোবৰ্দ্ধনকে সেই ডাইনীর মায়া-জাল হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ পুত্র পাছে স্ত্রৈণ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি গোবৰ্দ্ধনকে শ্যামার কাছে ঘেঁসিতে দিতেন না—এমন কি একদিন দিবাভাগে শ্যামার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া তিনি যষ্টি উদ্যত করিয়া গোবৰ্দ্ধনকে

তাড়া করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কেবল আহারের সময় ব্যতীত দিবাভাগে গোবর্দ্ধনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, পুত্র পিতার আদেশ এমন পালন করিতে শিখিয়াছিল যে, পিতার মৃত্যুর পর, অর্থের প্রয়োজন না হইলে সে, কি রাত্রি কি দিনমান কোন সময়েই, অন্তঃপুরে পদার্পণ করিত না। এইরূপে শ্যামার কৈশোরের সেই স্বামীর আদরনির্ঝরে আত্মবিসর্জ্জনের সকল সাধ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। শ্যামা যৌবনকালে স্বামীর হস্তে লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছে—আদর যত্ন পায় নাই। তখন সে লাঞ্ছনার ভয়ে স্বামীর ন্যায়-অন্যায় সকল আদেশ, নতমস্তকে পালন করিত, কিন্তু কালের গতিতে শ্যামারও স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! রূপ-যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে, স্বামীর ভালবাসা স্নেহ মমতা পাইবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাও তাহার হৃদয়ে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাই এখন আর শ্যামা তাহার স্বামীকে ভয় করে না, প্রত্যুত গৃহিণীকে সন্তুষ্ট না রাখিলে তাহার ধনজনপূর্ণ সংসার কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বাণচাল হইয়া পড়িবে, সেই ভয়ে গোবর্দ্ধনই এখন শ্যামার মুখাপেক্ষী। গোবর্দ্ধনের অন্তরের যে সামাজিক সম্ভ্রম পাইবার সাধ ছিল - শ্যামার হৃদয়ে সে দুর্ব্বলতাটুকুও স্থানলাভ করিতে পারে নাই। শ্যামা গোবর্দ্ধনের কথা শুনিয়া, স্বামীর দুর্ব্বলতার ও দুর্বুদ্ধির জন্য তাহার মুখের দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিল, "এ কাজে আমাকে জড়িও না। বেঁচে থাকতে ত উমার

সঙ্গে মুখ দেখাদেখি ঘুচিয়ে দিয়েছিলে, এখন সে সতী লক্ষ্মী স্বর্গে গেছে—তার মেয়েকে এনে যে আমি তোমাকে জাতে ওঠাবো, সে কাজ আমা হতে হবে না।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ওগো, তা নয় গো তা নয়, সেজন্যে কি বল্‌ছি, মেয়েটীর ভালর জন্যেই বল্‌ছি।"

শ্যামা উত্তর দিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা আর জানি না? আমার বোনঝির ভাল খোঁজবার জন্যে ত তোমার ঘুম হচ্ছে না। ওসব ছেঁদোকথা তোমার সেই জঙ্গলি মাগীদের কাছে বল গে—যাদের রাজরাণী করে দেবে বলে ঘর থেকে ভুলিয়ে এনে পদ্মাপারে চা-বাগানে চালান করে দিতে। আমি যেন কচি খুকি, কিছু বুঝতে পারি না।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "সত্যি সত্যি সম্বন্ধটা ভাল, হরনাথ বেঁচে থাকলেও এমন সম্বন্ধ জোটাতে পার্‌ত না। মেয়েটার নেহাত বরাত ভাল তাই—"

শ্যামা বলিল, "তা সে সম্বন্ধ ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমি ওসব হাঙ্গাম পোয়াতে পারব না। আর সে মেয়েই বা আমার কাছে আসবে কেন? তার জ্ঞান হয়েছে, সে কি আর আমাদের আগেকার কথা শোনে নি? তা ছাড়া আমি যদি তার ভাল করতে যাই, তবু লোকে বলবে তার মন্দ করছি।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "লোকে যা ইচ্ছে তাই বলুকগে না,

তুমি নিজে ত মনে জানছ যে, তার ভালর জন্তেই আমি এ কাজ কর্‌ছি—নইলে আমার কি মাথাব্যথা যে—”

শ্যামা বাধা দিয়া বলিল, “যাও যাও, ঐ সব মিথ্যে কথাগুলো শুনলে আমার হাড় জ্বলে যায়। তার বিয়ে ত তোমারই দেবার কথা—তাদের কি করেছিলে সে কথা কি মনে নেই? কিন্তু তা ত তোমার মতলব নয়—নিজে জাতে উঠবে, জমিদারদের সঙ্গে মিশতে পেলে তুমি একেবারে স্বর্গ-হাতে পাবে; তোমার সেই সব মতলব। তা যা ইচ্ছে তাই করগে, আমাকে এতে জড়িও না।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আচ্ছা তাই হবে গো—আমিই মেয়ে আনবার উপায় করছি। তুমি কিন্তু কোন কথায় থেকো না।”

শ্যামা বলিল, “কিন্তু মনে রেখো—যদি সেই জমিদার মিন্সের নষ্টামিতে ভুলে, মেয়েটার কিছু অনিষ্ট কর—যদি সম্বন্ধ ভাল না হয়, তা হলে আমি অনর্থ করবো।

গোবর্দ্ধন আশ্বাস দিয়া বলিল, “না গো না, সে ভাবনা নেই—জমিদারের ছেলে, খাওয়া পরার কখনো কষ্ট পাবে না, দেখ্‌তে শুন্তেও খাসা—কৈলেস ঘোষ গেরস্থ বৈত নয়।”

এইরূপে শ্যামা যাহাতে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিবন্ধক না হয়, গোবর্দ্ধন অগ্রে তাহার বিহিত করিল। শ্যামা ভাবিল, যদি তাহার স্বামীর জাতে উঠিবার হুজুগে, তাহার বোনঝির বড় মানুষের ঘরে বিবাহ হইয়া যায়—মন্দ কি? শ্যামা তাহার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মায়াবিনীর ফাঁদ।

শ্যামাকে আশ্বাস দিয়া গোবৰ্দ্ধন বহির্বাটীতে গিয়া নিস্তারিণী দাসীকে ডাকাইল এবং তাহার সহিত নিভৃতে বসিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ করিল। গোবর্দ্ধনের বাটীর দাস-দাসী মহলে নিস্তারিণীর অখণ্ড প্রতাপ। দুষ্টলোকে কাণাঘুষা করে, নিস্তারিণী পূর্ব্বে আড়কাটি ছিল, একবার একটা চা কুলীর মোকর্দ্দমায় মনিবকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে জেল খাটিয়া আসিয়াছে এবং আরও অনেকবার সে মনিবকে অনেক শঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া কূট-বুদ্ধির ও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছে। সেইজন্য বিলাসপুর হইতে চলিয়া আসিবার সময় গোবর্দ্ধন তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে নাই—সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিছে।

নিস্তারিণী সেই দিনই হরিহরপুরে গিয়া কৈলাসচন্দ্রের বাটী দেখিয়া আসিল এবং দুইদিন ধরিয়া গোপনে ও কৌশলে কৈলাসচন্দ্রের পরিবারবর্গের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া আসিল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে সে একজন দ্বারবান সঙ্গে লইয়া একখানি পাল্কী সমেত কৈলাসচন্দ্রের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন শুক্রবার কৈলাসচন্দ্র বা রমেশ

কেহই বাড়ীতে ছিল না। বহির্বাটীতে পাল্কী রাখিয়া ও দ্বারবানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিস্তারিণী একেবারে অন্দরে প্রবেশ করিল এবং যেন কত পরিচিতার মত বলিল, "কোথায় গো গিন্নি মা—আমাদের শান্তি দিদি কোথায় ?"

পাল্কীবাহকদিগের কণ্ঠশব্দ শুনিয়া বাটীর সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মকাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিস্তারিণীকে দেখিয়া যোগমায়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা বাছা ? কোথা থেকে আস্‌ছ ?"

নিস্তারিণী বলিল, "শান্তি দিদির মাসীমার বাড়ী থেকে এসেছি গো মা।"

রামের মা সেই কথা শুনিয়া নিস্তারিণীর নিকটে আসিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কৈ গো বাছা, তোমাকে ত কখনো দেখিনি ? আর শান্তির মাসীর যে এই কালকালান্ত পরে বোনঝির খোঁজ পড়েছে, তবু ভাল !"

অন্য কেহ হইলে রামের মার তীব্র দৃষ্টিতে হয়ত থতমত খাইয়া যাইত, কিন্তু নিস্তারিণী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া উত্তর দিল, "মা ঠাকরুণ কি এদেশে ছিলেন বাছা, না তিনি জান্‌তেন যে, মাসীমা মারা গেছেন। তাঁর অসুখ শরীর বলে দেশে এনেও বাবু তাঁকে এতদিন সে কথা শোনান নি। কাল তোমাদের গাঁয়ের কে একজন বামুনের মেয়ে বেড়াতে গিয়ে কথায় কথায় সে কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে। সেই অবধি মা ঠাকরুণ কেঁদেকেটে একসা করছেন, দণ্ডে দণ্ডে ফিট্ হচ্ছে,

বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেছে। মুখে কেবল সেই এক কথা—তার মেয়েটাকে এনে দে, একবার দেখি যদি তাতে এই পোড়া বুকটা একটু জুড়োয়। এই কথা বলছেন আর মাসীমার নাম করে বুক চাপড়ে কাঁদছেন। খাবেন না দাবেন না—বোঝাতে গেলে বুঝবেন না; বাবু আর কি করেন, বল্লেন, যা নিস্তার যা একবার যদি তোর মাসীমার মেয়েকে আনতে পারিস্—নইলে কার সাধ্য ওকে তুলে এক ফোঁটা জল খাওয়ায়, দেখছিস্ ত? আমি তাই একেবারে পাল্কী নিয়ে এসেছি।”

রামের মা এতক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে নিস্তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সে পূর্ব্বে শ্যামাকে কয়েকবার দেখিয়াছিল, তাহাতে শ্যামার যে চিত্র তাহার মনে মুদ্রিত হইয়াছিল, সে চিত্রের সহিত এই নিস্তারিণীর বর্ণিত চিত্রের—খাপ্ খাইতেছিল না। রামের মা কিছুতেই মনের মধ্যে সেই পরস্পর বিরোধী চিত্রদ্বয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারিল না। সে একবার ভাবিল, সময়ের গতিতে হয় ত বা শ্যামার স্বভাবে এই রকমই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু তাহার মনের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া যোগমায়া শান্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কি মা, যাবে? তোমার মাসীমা কান্নাকাটি কচ্ছেন, একবার তাঁকে দেখে আসবে?” যোগমায়া নিস্তারিণীর মুখে শ্যামার শোকাকুল অবস্থার কথা শুনিয়া যথার্থই করুণায় আর্দ্র হইয়াছিলেন।

শাস্তি যখন তাহার মাসীকে দেখিয়াছিল, তখন তাহার বয়স দুই বর্ষ মাত্র। শাস্তির সে কথা মনেও ছিল না এবং উমার মুখে যদিও সে তাহার মাসীর প্রতারণার কথা শুনে নাই, তথাপি মাসীকে দেখিতে যাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; অথচ নিস্তারিণীর মুখে তাহার মাসীমার ভগ্নি বিয়োগ-দুঃখের কথা শুনিয়া 'যাব না' বলিতেও শাস্তির চক্ষুলজ্জা হইতেছিল। সে বলিল, "আমি কি বলব জ্যাঠাইমা, তুমি যা বল তাই হবে; সুধা সঙ্গে যাবে ত?"

যোগমায়ারও শাস্তিকে একাকী যাইতে দিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুধার যাইবার কথা শুনিয়া নিস্তারিণী হাঁ কি না কিছুই বলিল না দেখিয়া যোগমায়া বলিলেন, "সুধা কি করে যাবে মা? এখন তোমার মাসীমার শোক দুঃখুর সময়, তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, তুমিই যাও।" পরে নিস্তারিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কেমন গো বাছা, আজই রেখে যাবে ত? নইলে মেয়ে একলা সেখানে রাত্তিরে থাকতে পারবে না—আমার কাছটীতে না হ'লে ওর ঘুম হয় না।" প্রকৃত কথা এই যে, শেষ মুহূর্ত্তে যোগমায়াব নিজেরই মন, যদি শাস্তিকে রাত্রিতে না পাঠায় সেই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

নিস্তারিণী বলিল, "আজই রেখে যাব বই কি, মাঠাকরুণ একটু ঠাণ্ডা হলেই রেখে যাব। তার পর আসা যাওয়া করলেই হল— কতক্ষণেরই বা পথ, জোর ক্রোশ দেড়েক হবে।"

যোগমায়া একটু আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন, "তাই বলছি বাছা, কর্ত্তা বাড়ীতে নেই—না জিজ্ঞেস করে পাঠাচ্ছি কি না।"

নিস্তারিণী বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে মা—এ ত আর পরের বাড়ী যাচ্ছে না, আপনার মাসীর কাছে যাচ্ছে।"

সেখানে ভোলার পিসী, মিত্রদের গৃহিণী প্রভৃতি প্রতি-বেশিনী যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই নিস্তারিণী তাহার মাতাঠাকুরাণীর যে ভগ্নীস্নেহ-জনিত শোকের বর্ণনা করিয়াছিল তাহাতে বিগলিত হইয়া গিয়াছিল—তাহারা সকলেই নিস্তা-রিণীর কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "তা বটেই ত।"

যোগমায়া কিছু অপ্রতিভা হইয়া শান্তিকে বলিলেন, "তা যাও মা, কাপড় সেমিজটা বদলে এস, আর একটা জামা গায়ে দিয়ে এসগে। সুধা ওর চুলটা একটু বেঁধে ঠিক করে দে মা। মাসীর কাছে আর সেজে-গুজে যেতে হবে না, শুধু নতুন গথ রি কগাছা আর নেকলেসটা না হয় পরে যা'ক।" পরে নিস্তারিণীকে বলিলেন "এস মা, এত রদ্দুরে তেতেপুড়ে এসেছ, একটু জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। যারে সুদর্শন, দরো-য়ানকে হাত পা ধুতে বলগে।"

নিস্তারিণী বলিল, "আমরা খেয়েই আসছি মা, এ ত ঘরের কথা।" পাছে বিলম্ব হয় সেই ভয়ে সে জল খাইতে আপত্তি করিল। কিন্তু যোগমায়া সে কথা শুনিলেন না—

ঘরে চিনির পুলি ও ক্ষীরের লাড়ু প্রস্তুত ছিল তাহা উভয়কেই খাইতে দিলেন।

পরে শান্তি প্রস্তুত হইয়া আসিলে যোগমায়া বলিলেন, "যা রামের মা, তুই সঙ্গে যা, আর সুদর্শনও যাক—যদি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায় ?"

নিস্তারিণী সে কথা শুনিয়া বলিল, "বুড়ো মানুষকে কেন আর মিথ্যে কষ্ট দেবেন—আমি সন্ধ্যের আগেই দরওয়ানকে সঙ্গে করে রেখে যাব এখন।"

যোগমায়া সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পাল্কীতে উঠিবার সময় শান্তির চক্ষু ছল ছল করিতেছে এবং সুধারও মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া যোগমায়ার মন ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "না বাছা ওরা সঙ্গে যাক। মেয়ে আমার একলা কোথাও কখন যায় নি—ওরা সঙ্গে গেলে তবু আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা থাকবে।"

নিস্তারিণী সে কথার আর প্রতিবাদ করিল না। সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হওয়াতে সে মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রামের মা ও সুদর্শন পদব্রজে দ্বারবানের ও নিস্তারিণীর সঙ্গে পাল্কীর অনুগমন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

জালবদ্ধা হরিণী

গোবর্দ্ধনের বাটীতে পৌঁছিয়া পাল্কী একেবারে অন্দর-মহলের দ্বারে গিয়া লাগিল। সদর দরজা পার হইয়া পাল্কী যখন উঠানের উপর দিয়া যাইতেছিল—সুদর্শনও পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিল। দেউড়িতে যে দ্বারবানেরা বসিয়াছিল তাহাদের একজন সুদর্শনকে ডাকিয়া বলিল, "এই—তোম্ মরদ্ আদ্মি উধার কাঁহা যাতা—হিঁয়া বৈঠো।" সুদর্শন দেউড়িতেই দ্বারবানদের কাছে বসিয়া রহিল।

শান্তি পাল্কী হইতে বাহির হইলে নিস্তারিণী তাহাকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া হাত ধরিয়া উপরে লইয়া চলিল। বামের মাও সঙ্গে সঙ্গে উপরে যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া নিস্তারিণী অপর একজন ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "এই রামী, যা এঁকে নিয়ে গিয়ে খিড়কীর ঘাট থেকে হাত পা ধুইয়ে এনে তোদের ঘরেই বসাগে যা—আমি আসছি, ওপরে নিয়ে যাস্নি।" এই কথা বলিয়া নিস্তারিণী "এস দিদি এস" বলিয়া শান্তিকে দ্বিতলে লইয়া গেল।

প্রকাণ্ড বাটী; সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দুইটা সুদীর্ঘ দরদালান ও বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া, অনেকগুলি কক্ষের দ্বার দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া, শেষে একটা সুপরিসর কক্ষে শান্তিকে

লইয়া নিস্তারিণী প্রবেশ করিল। গৃহতলে বসিয়া একজন অল্পবয়স্কা বিধবা বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিতেছিল—একজন স্থূলকায় সধবা স্ত্রীলোক একাগ্রমনে সেই বিচিত্র কাহিনী শুনিতেছিল। নিস্তারিণী সধবা স্ত্রীলোকটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শান্তিকে বলিল, "ইনিই তোমার মাসীমা, গড়্ কর।"

শান্তি ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল, কিন্তু শ্যামার দেহে কোনরূপ অসুস্থতার চিহ্ন বা মুখে কোনও শোকের বিষণ্ণতা-না দেখিয়া বিস্মিতা হইল।

শ্যামা সহজভাবে বলিল, "ওমা! এই উমার মেয়ে—এতবড় হয়েছে!"

বিধবাদের মধ্যে একজন শান্তিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বাঃ—যার নাম সুন্দরী বটে বাপু—দিব্যি মেয়ে।"

শ্যামা বলিল, "হ্যাঁ, ওর মার মতনই আদল আসে—সেও দেখতে বেশ ছিল, তাতে আমাতে এক মায়ের পেটের বোন বলে বোধ হত না। তা হোক বাপু, এতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় রেখে কি করে লোকের গলায় জল ওলে কে জানে!"

নিস্তারিণী সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "একেই বলে আঁতের টান! তুমি মায়ের বোন মাসী—তোমায় দেখেই বুকটা ছাঁত্ করে উঠলো—আর তাদের কি বল না। নিচে পর বই ত নয়, কি বল গো বামুন দিদি?"

শান্তিকে সঙ্গে করিয়া যখন নিস্তারিণী উপরে উঠিয়া আসে তখন বামুন দিদি ভোজনান্তে, নীচের রোয়াকে দাঁড়াইয়া খড়িকা খুঁটীতে ছিলেন। শান্তিকে দেখিয়া তাহার পরিচয় পাইবার জন্য তাঁহার কৌতূহল এতই প্রবল হইয়াছিল যে আচমনে বিলম্ব না করিয়া খড়িকা হাতে করিয়াই তিনি ত্বরিতপদে সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিস্তারিণী তাঁহাকে মধ্যস্থ মানাতে মহা প্রীত হইয়া তিনি শ্যামার মন যোগাইবার জন্য বলিলেন, "সে কথা কি আর একবার করে বলতে নিস্তার, মা আর মাসী কি ভেন্ন—দেখাশুনা ছিল না, এই যা বল।"

সে কথায় শ্যামার মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হওয়াতেই বোধ হয় অতীতের প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য সে বলিল "যা নিস্তার যা, বোনঝিকে নিয়ে গিয়ে জলটল খেতে দিগে যা।"

সেই কথা শুনিয়া নিস্তারিণী শান্তিকে সঙ্গে করিয়া রান্নাবাটীর ছাদ অতিক্রম করিয়া বাটীর পশ্চাৎ ভাগে দ্বিতলেরই আর একটী কক্ষে লইয়া গেল। সেই কক্ষের মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাটীর পশ্চাতের পুষ্করিণী ও বাগান দেখা যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটী পঞ্চম বর্ষবয়স্ক বালকের হাত ধরিয়া একটী প্রৌঢ়া দাসী ও একটী ৮।৯ বর্ষবয়স্কা বালিকা এবং আর একজন অল্প বয়স্কা দাসী আসিয়াছিল। নিস্তারিণী প্রথমোক্ত দাসীকে বলিল, "তোরা আবার এখানে কি করতে এলি? যা, খোকাকে—বিনুকে এখান থেকে নিয়ে

যা।" বালক ও বালিকাকে লইয়া প্রৌঢ়া পরিচারিকা চলিয়া যাইলে. নিস্তারিণী নবীনা দাসীকে বলিল, "নীরদা, তুই এইখানে বোস্। কোথাও যাস্নি, আমি জল খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছ ?" এই কথা বলিয়া নিস্তারিণী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অপর একজন হিন্দুস্থানী দাসী রেকাবে করিয়া জলখাবার ও এক গ্লাস পানীয় জল লইয়া আসিল এবং নীরদাকে বলিল, "তোম্ যাও, হাম্ হিঁয়া রহেগা।" শান্তি দেখিল সেই বালক ও বালিকাটী ছাদের অপর প্রান্তভাগ হইতে উৎসুকনয়নে তাহাকে এক একবার দেখিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহারা আর নিকটে আসিতে সাহস করিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পরে নীরদা আসিয়া বলিল, "ওমা, জলখাবারে হাতও দেওনি যে—খাও বাছা, একটু জলটল খাও। কখন সকালে ভাত খেয়ে এসেছ।"

শান্তি বলিল, "না, আমার ক্ষিধে নেই—আমি এখন কিছু খাব না।" কিন্তু নীরদা সে কথা শুনিল না, "সে কি হয়" বলিয়া সে শান্তির নিকটে রেকাবখানি হাতে করিয়া ধরিল। তাহার মুখে চোখে একটা সহানুভূতির ভাব দেখিয়া শান্তি তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু নীরদা সেখানে অধিকক্ষণ রহিল না। সে বলিল, "আমি যাই বাছা—এখনি নিস্তার এসে পড়বে।" এই কথা বলিয়া সে সতর্কভাবে এদিক্ ওদিক চাহিয়া দ্রুতপদে গিয়া ছাদের উপর

হইতে কাপড় তুলিতে লাগিল, যেন সেই কাজের জন্যই সে সেদিকে আসিয়াছিল।

তাহার পর আরও এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, ছাদের উপর হইতে রৌদ্র অপসৃত হইল। তথাপি নিস্তার বা রামের মা কেহই আসিল না এবং শ্যামাও শান্তির আর কোনই খোঁজ খবর লইল না। শান্তি এতক্ষণ যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার সে হিন্দুস্থানী ঝিকে বলিল, "ও গো নিস্তারিণীকে একবার ডেকে দাও।"

সেই হিন্দুস্থানী ঝি ছাদের উপর হইতেই নীচের রান্না-বাটীর উঠানে কাহাকে ইঙ্গিত করিল। পরক্ষণেই আর একজন হিন্দুস্থানী দাসী তাহার নিকট আসিলে সে তাহাকে কি বলিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিস্তারিণী আসিয়া বলিল "কেন গো বাছা—ডেকেছ কেন? আজ ত তোমার যাওয়া হবে না—তোমার মেসো মশায় বাড়ী নেই, তিনি আসুন, দেখা কর।"

শান্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "তা' না হয় আর একদিন এসে দেখা করে যাব। আজ ত বলে আসিনি। আজকে থাকতে পারব না।"

নিস্তারিণী বলিল, "সেজন্যে ভেবো না; সে আমি তোমাদের রামের মাকে দিয়ে বলে দিয়েছি।"

শান্তি চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি! রামের মা চলে গেছে না কি?"

নিস্তারিণী বলিল, "তা নয়ত কি! তারা জানে মাসীর কাছে এসেছ—দুদিন না রেখে কি আর পাঠাবেন!"

শান্তি ক্ষুব্ধা ও বিচলিতা হইয়া বলিল, "তা আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না কেন? সুদর্শনও চলে গেছে? তা হলে আমাকে নিয়ে যাবে কে? আমি বাপু রাত্তিরে এখানে থাকতে পারব না, তুমি আমায় রেখে এসো।"

নিস্তারিণী বলিল, "ও মা তা কি হয়? বাবু বলে গেছেন, তিনি এসে দেখা করবেন। মাসীর বাড়ী এসেছ, জলে ত আর পড় নি। আজ কিছুতেই যাওয়া হবে না।" এই কথা বলিয়াই নিস্তারিণী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

শান্তি স্তম্ভিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সে তাহার মাসীকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল—নিস্তারিণী যাহা কিছু বলিয়াছিল সর্ব্বৈব মিথ্যা। সে যে কয় মিনিট তাহার মাসীর সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিল সে সময় তাহার মাসীর আকার ইঙ্গিতে তাহার প্রতি স্নেহ-মমতার কোন লক্ষণই শান্তি লক্ষ্য করে নাই। শান্তি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, কেন তাহাকে নিস্তারিণী লইয়া আসিল এবং কেনই বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেছে। মাসীর যদি তাহাকে দেখিবারই ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা হইলে এ প্রবঞ্চনার বা ব্যস্ততার কি প্রয়োজন ছিল? পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়া যে কোন দিন ত আনিতে পারিত। রামের মা ও সুদর্শন যে সহজে তাহাকে ফেলিয়া, তাহার সহিত দেখাও না করিয়া,

সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে সে কথা শান্তির বিশ্বাস হইল না। নিশ্চয়ই তাহাদেরও কোনরূপ প্রতারণায় ভুলাইয়া ইহারা বিদায় করিয়া দিয়াছে। শান্তির মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে জানালার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। বাগানের নারিকেল গাছের চূড়ায় চূড়ায় অস্তমান তপন যে স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িল। পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে কুলায় ফিরিয়া চলিল। শান্তির মন অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দূর দূরান্তর হইতে সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শান্তির মনে পড়িল, প্রতিদিন সেই সময়ে সে তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া দিতে যাইত—সুধা শাঁক বাজাইত। আজ এখন সুধাও কি তাহার কথা ভাবিতেছে? রামের মাও এই সময়ে প্রত্যহ দীপহস্তে তাহাদের পরিত্যক্ত বাটীতে শয়ন করিতে যাইত, সুদর্শন বুধী-গাভীকে মাঠ হইতে লইয়া আসিয়া গোশালায় বাঁধিত—আজও কি তাহারা সেই সব কাজ ঠিক সেই ভাবেই করিতেছে? তাহার পর কোনও দিন বা সে, কোনও দিন বা সুধা, দীপালোকে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিত এবং সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া জপমালা হস্তে জ্যেঠাইমা তাহাদের কাছে গিয়া বসিতেন। আজও কি সুধা একাকী তাহার জ্যেঠাইমার ক্রোড়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া অন্যদিনের মত রামায়ণ পড়িতেছে? জ্যেঠাইমার কথা মনে পড়িতেই শান্তির চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। জ্যেঠাইমা যে তাহাকে একদণ্ডের জন্য চক্ষের আড়াল করেন

না। কোন দিন যদি তাহাদের ক্রীড়ার সঙ্গিনী সাবিত্রীদের বাটীতে বেড়াইতে গিয়া তাহারা দু'দণ্ড দেরী করিত—জ্যেঠাইমা যে তাহাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে লোক পাঠাইতেন এবং শেষে নিজে আসিয়া লইয়া যাইতেন। আজ জ্যেঠাইমা তাহার অভাবে কি করিতেছেন? সেই বা আজ জ্যেঠাইমাকে ছাড়িয়া—সুধাকে ছাড়িয়া, এই অজানা বাটীতে কি করিয়া কাটাইবে? চিন্তা করিতে করিতে শান্তির মন অবসন্ন হইয়া আসিল। রাত্রে সে কিছু আহার করিল না। সেই গৃহেই সে শুইয়া রহিল। নিস্তারিণী আর সে রাত্রে তাহার সহিত দেখা করিল না। তাহার মেসো মহাশয়েরও শান্তি কোনও সাড়া শব্দ পাইল না। দুইজন হিন্দুস্থানী পরিচারিকা,—একজন গৃহের অভ্যন্তরে আর একজন দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিল। শান্তির নিদ্রা হইল না, দিবসের দুর্ভাবনা রজনীতে দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া শান্তিকে অর্দ্ধনিদ্রিতা অর্দ্ধজাগরিতা, ভীতা, চকিতা, করিয়া রাখিল।

দশম পরিচ্ছেদ

'শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল'

ভোরের আলোর ফুটিতে না ফুটিতে শান্তি উঠিয়া, যে হিন্দুস্থানী দাসী তাহার কাছে শুইয়াছিল তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল এবং বলিল, "হয় আমাকে মাসীমার কাছে নিয়ে চল, নয় ত নিস্তারিণীকে ডেকে দাও।" দাসী তাহার সঙ্গিনীকে দিয়া নিস্তারিণীকে ডাকিয়া আনাইল। নিস্তারিণী আসিয়া বলিল, "এখনো কাক কোকিল ওঠেনি, এর মধ্যে আমাকে ডেকেছ কেন?"

শান্তি বলিল, "আমাকে বাড়ীতে রেখে এস।"

নিস্তারিণী উত্তর দিল, "এই কথা! তা যাবেই এখন—খাওয়া দাওয়া কর, সেখান থেকে লোক আসুক, তবে ত যাবে।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "রামের মা কি আসবে বলে গেছে?"

নিস্তারিণী বলিল, "হ্যাঁ গো—আসবে না ত কি?" এই কথা বলিয়া, উত্তরের অবসর না দিয়া, সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বেলা হইলে শান্তি বুঝিতে পারিল যে, বাটীতে অনেক নূতন লোকজন আসিয়াছে—দাস দাসীরা ছুটাছুটী করিতেছে;

শান্তি যে ঘরে বসিয়াছিল সে স্থান হইতে বহির্ব্বাটী দেখা যায় না, দেউড়ি অনেক দূরে। কিন্তু বহির্ব্বাটীতে হাঁকাহাঁকি হইতেছে, তাহা শান্তি মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতেছিল। একবার যেন তাহার মনে হইল, দেউড়ির দিক্ হইতে একটা উচ্চ কোলাহল আসিল এবং সেই কোলাহলের মধ্যে সে যেন একবার সুদর্শনের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল। শান্তি তখন আহার করিতে বসিয়াছিল। সে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং নিকটে যে হিন্দুস্থানী দাসী বসিয়াছিল তাহাকে বলিল, "দেখে এস ত, বাইরে আমাদের বাড়ী থেকে আমাকে নিতে লোক এসেছে কি না।" দাসী নিজে যাইল না—পূর্ব্বের মত তাহার সঙ্গিনীকে পাঠাইয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, শান্তিকে লইয়া যাইতে লোক আসে নাই, ভারবাহী মুটিয়ারা জিনিসপত্র আনিয়াছে, তাহারাই গোলমাল করিতেছে।

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল আসিল, তথাপি রামের মা বা সুদর্শনের দেখা নাই। শান্তির উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। সে ভাবিল এ কি হইল! জ্যোঠাইমা লোক না পাঠাইয়া কি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। সে দিন শনিবার—শান্তি ভাবিল, অপরাহ্ণ কালে জ্যোঠা মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিবেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন। কিন্তু অপরাহ্ণের আলোক গোধূলির আঁধারে মিলাইয়া গেল, তত্রাচ কেহ তাহাকে লইতে আসিল না দেখিয়া শান্তি পুনরায় নিস্তারিণীকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে বুঝিতে

পারিয়াছিল যে, হিন্দুস্থানী দাসী দুইটা তাহাকে প্রহরা দিবার জন্যই সেখানে অষ্টপ্রহর উপস্থিত আছে, শান্তির নিজেরও বাটীর অন্য কোন অংশে যাইবার হুকুম নাই, অপর কাহারও তাহার কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার অনুমতি নাই। নহিলে সেই নীরদা ঝি, যে তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, সে নিস্তারিণী আসিবার ভয়ে পলাইয়া গেল কেন এবং পুনরায় আসিল না-ই বা কেন? হিন্দুস্থানী দাসী দুইটার কথা শান্তি ভাল বুঝিতে পারে না এবং শান্তির নিজের কথাও তাহাদিগকে বুঝাইতে শান্তিকে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্থরগমনে বিষণ্ণ বদনে, নিস্তারিণী আসিল। তাহাকে দেখিয়াই শান্তি অধীরভাবে বলিল, "তুমি আমাকে মিছে কথা বলে ভুলিয়ে এনেছ; তুমিই আমাকে রেখে আসবে চল।"

নিস্তারিণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমর্ষ বদনে উত্তর দিল, "আর বাছা! কোথায় আর তোমাকে রেখে আসব বল?"

শান্তি বলিল, "কেন, আমাদের বাড়ীতে!"

নিস্তারিণী বলিল, "কৈলেস বাবুর বাড়ীতে? তবে সব কথা ভেঙ্গে বলি বাছা। ক'দিন আর চেপে রাখব বল? তাঁরা আর তোমায় নিয়ে যবেন না।"

শান্তি বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "নিয়ে যাবেন না! সে কি! কেন?"

নিস্তারিণী বলিল, "তোমার জন্যে নাকি তাঁদের ছেলের বিয়ে দিতে পার্ছেন না—বড় ঘরে সম্বন্ধ হয়েছে, দশ হাজার টাকা দেবে। কেবল তোমার মা বাপকে একটা কি কথা দিয়ে রেখেছিলেন বলে নাকি চক্ষুলজ্জার খাতিরে মহা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলেন—তুমি বাড়ীতে থাক্‌লে কি করে ছেলের বিয়ে দেন? সেই কথা শুনেই ত আমাদের বাবু তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এই যে, বাবু নিজেই এসেছেন, বল না গো—কি হয়েছিল, এ যে আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছে না।"

গোবর্দ্ধন নিঃশব্দে কখন গৃহের বাহিরে নিস্তারিণীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা শান্তি লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে নিস্তারিণীর আহ্বানে গোবর্দ্ধন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। শান্তি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাহাকে প্রণাম করিয়া একবার করুণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, "নিস্তার ঠিকই বলেছে মা। তোমাকে কি সাধে এনেছি? কৈলেস ঘোষ দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে বলে বেড়িয়েছে কি না তুমি তার গলগ্রহ হয়ে রয়েছ, তাই সে তার ছেলের বড় ঘরে বিয়ে দিতে পারছে না—মুস্কিলে পড়ে গেছে? আমি সেই কথা জানতে পেরে তার সঙ্গে আপিসে দেখা করে বল্লুম, এ সব কি কথা শুনছি ঘোষজা মশায়? আমার শালী-ঝি নাকি আপনার গলগ্রহ হয়েছে? কেন তার কি কেউ নেই? আমার পরিবারের বোনঝির জন্যে আপনি ছেলের বিয়ে দিতে পারছেন না, একি আমার কম লজ্জার

কথা। আমি এতদিন এদেশে ছিলাম না তাই মেয়েটী আপনার কাছে ছিল। আমি বেঁচে থাকতে তার বিয়ের ভাবনা? আপনি যেখানে ইচ্ছে আপনার ছেলের বিয়ে দিন গে—দেখবেন আমিও আমার শালীঝিকে ভাল ঘরে বরে দিতে পারি কি না? কৈলেস বাবু সেই কথা শুনে আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন, 'আপনি বড়লোক, আপনি আপনার শালীর মেয়ের বিয়ে দেবেন এর আর কথা কি? আর সত্যি কথা বলতে কি আপনি আমার যথার্থই তাহলে একটা উপকার করেন। আমি ছেলেটীর বিয়ে দিয়ে দুপয়সা পাই। কিন্তু একটু কৌশল করে মেয়েটীকে নিয়ে যাবেন; আমার পরিবারের তার উপর একটু টান পড়ে গেছে কি না—হাজার হোক মানুষ করেছে, ছেড়ে দিতে চাইবে না—মেয়ে মানুষ ত ভাল মন্দ বোঝে না।' আমি বল্লাম তাই হবে। সেই জন্যেই ত নিস্তারকে দিয়ে দু-একটা মিথ্যে কথা বলে তোমাকে আনিয়েছি। বুঝলে?"

শান্তি গোবর্দ্ধনের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও ক্ষোভে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে নতশিরে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া গোবর্দ্ধন বলিল, "আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি মা, এখন চল্লুম—নিস্তার দেখিস্ মেয়ের যেন কোন কষ্ট হয় না।" এই কথা বলিয়াই গোবর্দ্ধন ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল। নিস্তারিণী সেই হিন্দুস্থানী দাসীদের একজনকে সেই গৃহে দীপ জ্বালিয়া দিতে বলিল এবং আর একজনকে শান্তির

জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে ও আহারাদি আনিয়া দিতে আদেশ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হঠাৎ মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিলে লোকে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, গোবর্দ্ধনের কথা শুনিয়া শান্তিও সেইরূপ হইয়া গিয়াছিল। নিস্তারিণী যতক্ষণ উপস্থিত ছিল, ততক্ষণ সে দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন রকমে আপনাকে স্থির রাখিয়াছিল। নিস্তারিণী চলিয়া যাইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, শান্তির মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার পর তাহার চিন্তা শক্তি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। সে ভাবিল—না! এও কি কখন সম্ভব? যে জ্যেঠা মহাশয় শান্তি বলিতে অজ্ঞান হয়েন, মা লক্ষ্মী ভিন্ন অন্য নামে তাহাকে ডাকেন না, সেই জ্যেঠা মহাশয় টাকার জন্য তাহাকে গলগ্রহ ভাবিয়াছিলেন! না না সে কথা সত্য হইলে যে দিন রাত, চন্দ্র সূর্য্য সমস্ত মিথ্যা হইয়া যাইবে; ওসব এদের রচা কথা। ওকথা সত্য ভাবিলেও পাপ আছে। শান্তি যে সে কথা ভ্রমেও সত্য ভাবিয়াছিল সেই জন্য তাহার অনুতাপ হইল। কিন্তু পুনরায় শান্তির দুশ্চিন্তা আসিল—জ্যেঠা মহাশয় আজ বাড়ীতে এসেছেন তবে তিনি তাহাকে লইয়া যাইতেছেন না কেন? তিনি যে বাটী আসিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, সে কথা শান্তি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে ভাবিল নিশ্চয়ই ইহারা তাঁহাকেও একটা কোনও মিথ্যার

জালে ফেলিয়াছে কিন্তু তুচ্ছ তাহার জন্য কেন এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কৌশল ষড়যন্ত্র, তাহা সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, এ পাপ বাড়ীতে আঁর থাকা উচিত নয়; কিন্তু কি উপায়ে সে এই বিপদ হইতে মুক্ত হয়? শান্তি কোনও উপায়ই নির্দ্ধারণ করিতে পাঁরিল না। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, সে ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মায়াবিনীর নিজমূর্ত্তি

এ দিকে শান্তিকে পাঠাইয়া দিয়া যোগমায়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না; কখন শান্তি ফিরিয়া আসিবে সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ হইতেই সুধা ছাদে উঠিয়া, বারে বারে গিয়া পথপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কখন শান্তি আসে। শেষে সন্ধ্যার সময় শুধু রামের মাকে ও সুদর্শনকে ফিরিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কই রামের মা, শান্তি কই?"

রামের মা ম্লানমুখে উত্তর দিল, "তা'রা আজ পাঠালে না।"

রামের মার কণ্ঠস্বর শুনিয়া যোগমায়াও সেখানে আসিয়া-ছিলেন তিনি উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, "সে কিরে! পাঠালে না কি? শান্তি আমাকে ছেড়ে রাত্তিরে থাকতে পারবে কেন?" তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইল শান্তি থাকিতে পারুক আর নাই পারুক, তাঁহার নিজের পক্ষে শান্তিকে ছাড়িয়া থাকা কঠিন।

রামের মা বলিল, "কি করব জ্যেঠাই মা। তারা কিছু-তেই পাঠালে না, বলে মাসী বোনের জন্যে কেঁদে-কেটে বাড়ী

মাথায় কর্‌ছে—আজকের দিনটা মেয়েটী থাক—তবু বোনঝি কাছে থাকলে মাসীর প্রাণটা কতক ঠাণ্ডা থাকবে।”

যোগমায়া দুঃখিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“শান্তি কি বললে? থাকতে পার্‌বে?”

রামের মা বলিল, “খুকির সঙ্গে কি আর দেখা কর্‌তে দিলে? নীচে থেকেই যে সেই ঝি মাগী বিদেয় করে দিলে। খুকিকে, ওপরে তুলে নিয়ে গেল—আর আমাকে সেখানে যেতেই দিলে না। বল্লে তোমাকে দেখলে মেয়েটী যদি বাপু থাকতে না চায়—তা হলে মাঠাকরুণকে থামিয়ে রাখা ভার হবে। তাই হাতে ধরে বলে দিলে—আজকের দিনটা রেখে যা ভাই, কিছু মনে করিসনি—মাসীর কাছে থাকবে, কোন কষ্ট হবে না।”

সুদর্শন বলিল, “আমি মা তবু বল্‌লাম, রামের মা তুই ওদের কথা শুনে শান্তি দিদিকে রেখে যাচ্ছিস্, শেষে মা ঠাকরুণ তোকে মুক্ করবে অখন। আমি নিজেই বাড়ীর ভেতর যাচ্ছিলাম; তা দরোয়ানগুলো যেতে দিলে না।”

রামের মা বলিল, “তুই গিয়ে ত সব করতিস্। আমি আর তাদের বলতে বাকি রেখে এসেছি—বল্‌লুম খুকি তার জ্যেঠাইমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না—তাতে বল্‌লে, সে বলেছে পারবে।”

সুধা বলিল, “তুমি সে কথা শুনলে কেন? শান্তি যেতেই চাইছিল না, সে আবার বলেছে রাত্তিরে সেখানে থাক্‌বে!”

রামের মা বলিল, "তারা পাঠাবে না, হাতে ধরতে লাগল—তাদের সঙ্গে কাঁহাতক বকাবকি করি বল? যাক্, আজকের রাতটা, কাল সকালেই গিয়ে নিয়ে এসে তবে আমার অন্য কাজ!"

যোগমায়া সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনায় কাটাইলেন। সুধারও ভাল নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই সে উঠিয়া সুদর্শনকে ডাকিয়া তুলিল এবং রামের মাকে শান্তিদের বাটী হইতে ডাকিয়া আনিতে বলিল। রামের মা অন্য দিনের মত সে দিনও শান্তিদের পরিত্যক্ত বাটীতেই শয়ন করিতে গিয়াছিল। রামের মা আসিলে সুধা তাহাকে ও সুদর্শনকে শান্তিকে আনিতে যাইবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিল। যাইবার সময় যোগমায়া তাহাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন—"আজ আর যেন কালকের মত ফিরে এস না—যা করে হো'ক আনতেই চাও। যদি তেমন জেদ করে ত বোলো, আর একদিন তখন দেখা করিয়ে আনবে; কিন্তু আজ তাকে পাঠাতেই হবে!"

বেলা দশটার সময় ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সুদর্শন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না মা ঠাকরুণ, তারা লোক ভাল নয় গো। বাবুকে খবর পাঠান।"

যোগমায়া ভীতস্বরে বলিলেন, "বলিস্ কি রে, পাঠালে না! কেন? কি বল্লে, রামের মা কোথা?"

সুদর্শন বলিল, "রামের মা, পেছনে আস্‌ছে। আমাকে

দরোয়ানগুলো আজ বাড়ীতেই ঢুকতে দিলে না। শেষে বকাবকি থেকে হাতাহাতি হবার যোগাড় হ'ল। আমি একা আর তারা এক দঙ্গল। আর ভোজপুরী দরোয়ানগুলো বরং ভাল, এরা সব গাঁটকাটা বদমাস—গাঁয়ের একজন ভালমানুষ আমাকে আড়ালে ডেকে সাবধান করে দিলে। বল্‌লে ওরা সব দাগী আড়কাটী—বাবুর পুরোণো চাকর বলে এখন দরোয়ানী কাজ দিয়ে বাড়ীতে রেখেছে।"

সেই সময় রামের মা হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, "আর মা, খুকিটাকে এত করে মানুষ করে শেষে বাঘের মুখে তুলে দিলে!" এই কথা বলিয়া সে হতাশভাবে রোয়াকের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। যোগমায়ার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তারা কি মানুষ! ওরে বাবা, সেই মিছরিমুখো মাগী কেমন ভাল মানুষটী সেজে এখানে এসেছিল। আজ যেমন আমি বল্লুম খুকিকে না নিয়ে আজ আমি কিছুতেই যাব না—তাকে আজ পাঠাতেই হবে, অমনি মাগী যেন রায়বাঘিনী হয়ে খেতে এল! বল্‌লে, ইস্‌ ওঁর মা ঠাকরুণ খুকিকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না। কথায় বলে—'মায়ের চেয়ে ভালানি, তাকে বলে ডাইনি', মার বোন মাসী তার কাছে এসে আদর যত্নে রয়েছে, মেয়ে নিজে যাবার নামও করছে না—ওঁরা ঢং করে মায়া-কান্না শোনাতে এসেছেন। তার পর আমি যেই বল্লুম, আমি খুকির সঙ্গে দেখা করে তার নিজের মুখে শুনে যাবো—সে কেমন যেতে চায় না, সেই

কথা শুনে মাগী যা মুখে এল তাই বল্‌লে, খালি মারতে বাকি রাখলে।”

সুধা বলিল, “বাড়ীতে আর কেউ কি লোক ছিল না? শান্তির মাসীমার কাছেই গিয়ে বলে দিলে না কেন বুড়োদিদি?”

রামের মা দুঃখিত স্বরে বলিল, “মাসীর কাছে বলবো কি বাছা? সেখানে মাসী কালো কি ধলো তা চক্ষেও দেখিনি। আজ ওপরে যেতেই দিলে না। বাইরে দোতলার বৈঠকখানায় একঘর লোক বসে জটলা করছিল—বকাবকি শুনে তারা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। মেসো ওপর থেকে হেঁকে বল্‌লে, কেরে? কিসের গোলমাল রে নিস্তার? সে মাগী আমাদের বাবুর নাম করে বল্‌লে, তাঁর বাড়ীর লোক গো। মেসো বল্‌লে, তা হাঁকাহাঁকি কিসের, স্পষ্ট করে বলেদে মেয়েকে আর সেখানে পাঠান হবে না। নিস্তারিণী বল্‌লে, বলেছি, শুনছে না যে। মেসো বল্‌লে, ভাল কথায় না যায়, রামভজনকে বল বাড়ী থেকে বার করে দিক। বাড়ীতে এক বাড়ী লোক চারিদিক্ থেকে এসে জড় হয়ে শুনছিল। আমি ছোটলোকদের হাতে অপমান হবার ভয়ে মানে মানে ফিরে এলুম।”

সুধা জিজ্ঞাসা করিল, “অত গোলমাল শুনেও শান্তি এলো না?”

রামের মা উত্তর দিল, “খুকি আমার কি শুনতে

পেয়েছে ? বাড়ীটা যে মস্ত গো—তিন মহল, তাকে পেছন দিকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে—আহা ! তাকে কি আর দেখতে পেলুম । এখন বাবুকে খবর দিয়ে এর যা বিহিত করতে হয় কর—বাছা আমার সেখানে থাকলে কেঁদে কেঁদে মারা যাবে ।”

রামের মা শান্তিকে লালনপালন করিয়া এমনি তাহার মায়ায় পড়িয়াছিল যে,সে দেশে তাহার ভাইঝি ভাইপোদের যে পূর্ব্বে ২।১ বৎসর অন্তর গিয়া একবার করিয়া দেখিয়া আসিত, তাহাও দুই তিন বৎসর যায় নাই—শান্তিকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না,সেই ভয়েই সে দেশে যাইবার নাম করিত না । তাহার ভাই মধ্যে মধ্যে দেখা করিয়া যাইত। কোথাও তত্ত্ব লইয়া যাইলে, সেখানে যাহা মিষ্টসামগ্রী তাহাকে খাইতে দিত, তাহা লুকাইয়া লইয়া আসিয়া আড়ালে ডাকিয়া শান্তিকে দিত—ইদানীং শান্তি তাহাতে লজ্জিতা হইত । সুধা রামের মাকে রহস্য করিয়া বলিত, ‘ও কি হচ্ছে বুড়োদিদি ! শান্তি খেতে জানে আর আমি বুঝি খেতে জানি না ?’ ইহাতে অপ্রতিভ হইয়া রামের মা আপনার দুর্ব্বলতা ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিত । কিন্তু পুনরায় সেইরূপ করিত এবং শান্তির কাছে মৃদু ভৎর্সনা শুনিত। এক্ষণে সেই শান্তির জন্য তাহাকে পরের বাটীতে গিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল। সে কথা শুনিয়া যোগমায়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া রামের মার দুঃখে ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “কর্ত্তা বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁদের

না বলে কি ঝকমারি করেই আমি বাছাকে পাঠিয়েছিলুম। এখন কি করি বাপু!" তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তিনি অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "যা সুদর্শন, তুই দুমুঠো খেয়ে বারটার গাড়ীতেই কলিকাতায় যা—তাঁদের খবর দে।"

সুদর্শন বলিল, "এখন আর গিয়ে কি করব মাঠাকরুণ, আজ ত শনিবার। বাবু ত আজ বাড়ী আসবেন। আমি গিয়ে তাঁর দেখা পাব না। সন্ধ্যে অবধি চুপ করে থাক, আর কেঁদে কি করবে বল।"

অনন্যোপায় হইয়া যোগমায়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাটীর সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। প্রতিবেশিনীরা দলে দলে আসিয়া আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া গেল—শান্তি ও সুধার ক্রীড়ার সঙ্গিনী সাবিত্রী সেদিন আর সুধার কাছছাড়া হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে রোদন.

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কৈলাসচন্দ্র বাটীতে আসিলেন। যোগমায়া সকলকে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি যতক্ষণ না হাত মুখ ধুইয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে জলযোগ করিয়া সুস্থ হইলেন, ততক্ষণ তাঁহাকে কেহ শান্তির কথা কিছু বলিল না। কিন্তু তিনি নিজেই সকলের মুখে কি যেন একটা বিষাদের ছায়া—স্বাভাবিক প্রফুল্লতার অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে যোগমায়া, সুধা, রামের মা ও সুদর্শনের মুখে যখন তিনি সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন, তখন তিনি দুঃখে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিয়া তাহাদের আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি করিলেন না। যোগমায়াকে নিজের ত্রুটীর জন্য অনুতাপ করিতে দেখিয়া তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমার দোষ কি? তুমি কিছুই অন্যায় করনি। আমি বাড়ীতে থাক্‌লেও বোধ হয় যে কথা বলেছিল তা শুন্‌লে পাঠিয়ে দিতুম। যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন মা লক্ষ্মীকে আমার আনবার চেষ্টা দেখিগে।" এই কথা বলিয়া তিনি পত্নীকে প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু নিজে সেই আকস্মিক বিপদে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, গোবর্দ্ধনের এইরূপ আচরণের কারণ কি। গোবর্দ্ধন যে অসদুপায়ে লক্ষপতি হইয়া দেশে বাস করিতে আসিয়াছে তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা যে গোবর্দ্ধনকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছে তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু সে যে কেন প্রবঞ্চনা করিয়া শান্তিকে লইয়া গিয়া আটক করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বহির্ব্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার শুভানুধ্যায়ী, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী অনেকেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রতি শনিবারে রাত্রে ও রবিবার অপরাহ্নকালেই তাঁহারা সেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়া তাস পাশা প্রভৃতি খেলেন, গল্পগুজব করেন এবং কেহ বা কৈলাস বাবুর সহিত সদালাপে সময় অতিবাহিত করেন। যাঁহারা সকল দিন আসেন না তাঁহারাও সে দিন কৈলাস বাবুর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আসিয়াছিলেন এবং গোবর্দ্ধনের অন্যায় আচরণের তীব্র সমালোচনা করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণপাড়ার উমেশ চক্রবর্ত্তী সংবাদ দিলেন, "তারিণী ঘটক আজ প্রকাশ করে ফেলেছে যে, রেবতীকান্তের শালার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে গোবর্দ্ধন আপনার বাড়ী থেকে হরনাথের মেয়েটীকে কৌশল করে নিয়ে গেছে। রেবতীকান্ত নাকি গোবর্দ্ধনকে বলেছে যে, এই বিয়ে দিলেই সে গোবর্দ্ধনকে জাতে তুলে নেবে। গোবর্দ্ধন আজ নারদের

নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে। কালকের লগ্নেই বিয়ে দেবে ঠিক করেছে। রেবতীকান্তের কন্যার সঙ্গে আপনি রমেশের বিয়ে দিতে রাজি হ'ন নাই বলেই নাকি রেবতীকান্ত এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।"

সেই কথা শুনিয়া কৈলাসচন্দ্র হতবুদ্ধির মত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ভগ্ন-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাই ত কি করি? মা লক্ষ্মীকে আমার কি করে ফিরিয়ে আনি? মা যে আমার সুধার চেয়েও বেশী গা! যাই, নিজেই একবার গোবর্দ্ধন বাবুর কাছে গিয়ে বলে কয়ে দেখি কি করিতে পারি।"

সেই কথা শুনিয়া কৈলাসচন্দ্রের প্রতিবেশী হরিচরণ চৌধুরী বলিলেন, "আপনি নিরীহ লোক, আপনি একলা গিয়ে কি করবেন? গোবর্দ্ধনের মত ধড়িবাজ লোকের সঙ্গে আপনি কি কথায় পেরে উঠবেন। চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু হরিচরণ বাবুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। হরিচরণ বাবু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হ্যামারটন সাহেবের বাবু ছিলেন। সাহেব কার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইবার পর হরিচরণ বাবু দেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি আইন আদালত বুঝেন এবং কিছু সঙ্গতিও করিয়াছেন। হরিচরণ বাবুকে সকলেই বিচক্ষণ

ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। গোবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

হরিচরণের সঙ্গে কৈলাসচন্দ্র গোবর্দ্ধনের বাটীতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে পরদিন বিবাহের জন্য সমারোহের আয়োজন হইতেছে। গোবর্দ্ধন ও তাহার পারিষদ ও অনুচরবর্গ সকলেই মহা ব্যস্ত। গোবর্দ্ধন তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিতলের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইল। বৃহৎ বৃহৎ দর্পণে, তৈলচিত্রে, শ্বেতপ্রস্তরের ও ব্রঞ্জের মূর্ত্তিতে, বহুশাখা-বিশিষ্ট ঝাড়ের শ্রেণীতে এবং গিল্‌টিকরা ফ্রেমের টানাপাখায় সুসজ্জিত সেই বিশাল কক্ষ গোবর্দ্ধনের সুরুচির পরিচয় না না দিলেও তাহার ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। হরিচরণ বাবু বলিলেন, "গোবর্দ্ধন বাবু যে দেখছি ঘোষালদের সেই পুরাণ বাড়ীটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলেছেন—আর চেনবার যে । নেই।"

গোবর্দ্ধন প্রীত হইয়া সস্মিতবদনে কহিল, ব্লাকবার্ণ কোম্পানিদের কণ্ট্রাক্টে দিয়ে দিছলুম্, কি না, তারাই যা হয় করেছে। সাজগোজ, ফার্ণিচার টার্ণিচার যা দেখছেন, সে সব আমি নিজেই পছন্দ করে কিনে এনে সাজিয়েছি।"

হরিচরণ তৈলচিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি।" হরিচরণ বাবুর উক্তিটা সুখ্যাতি কি শ্লেষ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া

গোবর্দ্ধনের নর্ম্মসচিব রায় মহাশয় বলিলেন, "বাড়ীর ভেতরের ঘরটরগুলোও এই রকম সব ছবিতে সাজিয়েছেন।"

হরিচরণ বাবু বলিলেন, "এই সব উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা!"

রায় মহাশয় বলিলেন, "আজ্ঞে না, এ সব বিলাতী অয়েলপেণ্টিং—দেখছেন না?"

হরিচরণ বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুল হয়েছে—এরা সব সভ্যদেশের বিশ্বেশ্বরী। উর্ব্বশী রম্ভাদের হাবভাবে, মুখে চোখে তবু একটু লজ্জাসরমের চিহ্ন যদি বা থাকৃত, এঁদের আর সে বালাই একেবারেই নেই।"

রায় মহাশয় পূর্ব্বে গ্রামের গুরুমহাশয় ছিলেন, এক্ষণে গোবর্দ্ধনের আশ্রয়ে আসিয়া মোসাহেবগিরিতে প্রোমোশন পাইয়াছেন। তিনি হরিচরণ বাবুর মন্তব্যের ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু গোবর্দ্ধন বুঝিতে পারিল হরিচরণ বাবুর কথাগুলায় একটা কি প্যাঁচ আছে। কথাটা চাপা দিয়া সে বলিল, "তা হ'লে হরিচরণ বাবু, কি মনে করে গরীবের কুঁড়েয় পায়ের ধুলো পড়্‌ল সেটা শুন্‌তে পাই কি? দেখেছেন ত আজ একটা কাজে ব্যস্ত আছি।"

হরিচরণ আর কোনরূপ গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া কৈলাসচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আমার প্রতিবাসী কৈলাস বাবু—এঁর পালিতা কন্যাটীকে আপনি দু'দিন এনে রেখেছেন।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও! ইনিই কৈলাস বাবু, ওঁর দর্শন

পেলুম, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। হরনাথের মেয়েটীকে এতদিন উনি লালনপালন করেছেন, তাতে ওঁর কাছে আমি বড়ই কৃতজ্ঞ। আমার শালীর যখন মৃত্যু হয়, তখন যদি আমরা এখানে থাকতুম তা হলে কি আর মেয়েটী ওঁর গলগ্রহ হত!"

কৈলাস বাবু জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "করেন কি মহাশয়! ও কথা বলবেন না। মা লক্ষ্মীকে আমি নিজের মেয়ের মতনই দেখি।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি তাই ও কথা বল্‌ছেন। নইলে ক'জন লোকে ও রকম ভাবে। তা যাই হোক আপনি ঢের করেছেন, আর আপনার দয়ার ওপর দাবী করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। মেয়েটীর ভার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমারই নেবার কথা। সেই ভার আমি নিয়েছি, তাতে আর আপনার চিন্তার কি কারণ আছে?"

হরিচরণ বাধা দিয়া বলিলেন, "ওহে ওসব ছেঁদো কথা রাখ। মেয়েটীকে ওঁর পরিবার মানুষ করেছেন, কখনও কাছ-ছাড়া করেন নি। তিনি কান্নাকাটি কর্চ্ছেন, এখন মেয়েটীকে পাঠিয়ে দাও।"

গোবর্দ্ধন—"তা আর পারছি কৈ হরিচরণ বাবু। মেয়েটীর যে বিয়ে দেবার ঠিক করেছি, কালই বিয়ে। তাইত এই সব আয়োজন দেখছেন।"

হরিচরণ—"মেয়েটির বিয়ে দেবার জন্যে তোমার এত লাত তাড়াতাড়ি মাথাব্যথা পড়ে গেল কেন? তুমি কি জান

না যে কৈলাস বাবু মেয়েটীকে পুত্রবধূ করবেন বলে হরনাথ বেঁচে থাকতেই কথা দিয়ে রেখেছেন।"

গোবৰ্দ্ধন—"সেই রকম একটি গুজব শুনেছিলুম বটে; কিন্তু মেয়েটী যে রকম বয়স্থা হয়ে উঠেছে, তাতে ওঁর যে সে মতলব আছে বলে ত বিশ্বাস হল না।"

হরিচরণ—"ছেলেটী পড়াশুনা করছিল বলে উনি এত দিন বিবাহ দেন নি; আর মেয়ে বড় হলে বরপক্ষ থেকেই আপত্তি হয়ে থাকে, তা ওঁর যখন সে আপত্তি নেই তখন তোমার সে ভাবনা কেন?"

গোবৰ্দ্ধন,—"তা ওঁর ছেলে লেখা পড়া শিখেছে, উনি বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে বিলক্ষণ দু'পয়সা পেতে পারবেন। আমার স্ত্রীর গরিব বোনঝিটীকে বৌ করে উনি কেন নিজের ক্ষতি করতে যাবেন? আর আমরাই বা ওঁকে সে ক্ষতি সহ্য করতে দেব কেন?"

হরিচরণ—"হ্যাঁ, ছেলের বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি করবার সাধ আজকাল অনেকেরই হয়েছে বটে, ওঁর সে সব বুদ্ধি নেই, নেহাত সেকেলে মানুষ। সে যাক, তুমি যে জন্যে মেয়েটীকে আটক করেছ তা সকলেই জানতে পেরেছে, তার আর ঢাকা-ঢাকির দরকার নেই। সোজা কথা যা বলি তা শোন, ওঁদের মনে কষ্ট দিও না, আর মেয়েটীকে জলে ফেলে দিও না।"

গোবৰ্দ্ধন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "জলে ফেলে! কি

বলেন মশায় ? হারাণপুরের দেওয়ান বাড়ীর ছেলে, রেবতী-কান্ত বাবুর শালা, সে কি যে-সে পাত্র !”

হরিচরণ—“আচ্ছা ভায়া সে কথা নিয়ে আর তোমার সঙ্গে মিছে কথাকাটাকাটি করব না। এখন তুমি ভালয় ভালয় মেয়েটিকে পাঠাবে কি না তা বল ?”

গোবর্দ্ধন—“তা হলে আমাকেও বাধ্য হয়ে বলতে হল, না মশায়, মেয়ে পাঠাব না।”

হরিচরণ—“তুমি মেয়েটিকে প্রবঞ্চনা করে নিয়ে এসে আটক করে রেখেছ, এর জন্যে তোমাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হবে তা ভেবে দেখেছ—পিনাল কোডের ৩৬১ ধারাটা জানা আছে ত ? যখন ভুলিয়ে এনে আটক করে রেখে জোর করে বিয়ে দিতে বসেছ তখন ৩৬৬ ধারাটাও খেটে যাবে।”

গোবর্দ্ধন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,“মহাশয় বিচক্ষণ লোক হয়েও যে ও কথাগুলো বল্‌বেন তা আমি আশা করি নি। আপনি কি মনে করেন, আমার জানা নেই যে আমার শালী লেখাপড়া করে আদালত থেকে কৈলাস বাবুকে তাঁর মেয়ের অভিভাবক নিযুক্ত করে যান নি। তা হলে আমার পরিবারই মেয়েটীর, আইনেও বটে আর ন্যায়ে ধর্ম্মেও বটে, যথার্থ অভি-ভাবিকা ! আমার পরিবার যদি তার বোনঝির বিয়ে দেয়, সে বিয়ে কি আর কারও সাধ্য আছে যে রদ করে ? মেয়ে ত এখন নাবালিকা, তার আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কি ?”

হরিচরণ বলিল, "সে সব সওয়াল জবাব আদালতে গিয়ে হবে। তা হলে তুমি সহজে পাঠাবে না এইটেই ঠিক করলে ?"

গোবর্দ্ধন, "আজ্ঞে সেকথা ত প্রথমেই বলেছি। গরিবের কথাটা কাণ দিয়ে শুনলে আর এতক্ষণ মিছে বকাবকি করতে হত না। আমি ত কাল বিয়ে দেব, তারপর আইন আদালত করতে হয় আপনারা করবেন। হাইকোর্ট—প্রিভিকৌন্সীল অবধি উঠতে হয়, তাতেও গোবর্দ্ধন দত্ত পেছপাও নয় জানবেন। চলহে, ওদিকে কি হচ্ছে আমরা দেখিগে।"

এইবার রায় মহাশয় অবসর বুঝিয়া টিপ্পনী কাটিলেন, "মশায় এ আটাশে ছেলে পান নি, দুকথায় কেল্লা ফতে করে যাবেন। এ যে সে লোক নয়, স্বয়ং গোবর্দ্ধন দত্ত! এ তল্লাটের কে কত বড় মরদ্ তা ত আর জানতে বাকি নেই। হাজার টাকা বার করতে বাছাধনদের জিভ বেরিয়ে পড়বে, আর দত্তজা এক কথায় এইখানে বসে লাখ টাকা গুণে দেবে এখন। নাহক্ কেন কাজের হরকৎ কর্ত্তে এসেছেন মশায়, মানে মানে সরে পড়ুন।"

হরিচরণ বাবু বলিলেন, "যা বলেছেন মশায়, কার কাছে এসেছি সেটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। আসুন কৈলেস বাবু, চলে আসুন।"

সেই রাত্রেই হরিচরণ বাবু কৈলাসচন্দ্রকে জেলাকোর্টের উকিল গদাধর চাটুর্য্যের কাছে লইয়া গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া গদাধর বাবু বলিলেন, "কাল রবিবার হয়েই সব মাটি

করেছে মশায়, নইলে কাল কোর্ট থেকে এ বিয়ে বন্দ করবার একটা হুকুম বের করে নিলেই উপস্থিত বিপদ্‌টা কেটে যেত। তারপর অভিভাবক প্রমাণ করা এরপরে সাক্ষী দিয়ে হতে পারত—ওদের সঙ্গে হরনাথ বাবুর পরিবারের মুখ দেখাদেখিও ছিল না, সেটাও সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করে দিতুম। কিন্তু কাল আদালত যে বন্ধ; আমি ত এর প্রতিকারের কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।"

পরিশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হতাশ হইয়া উভয়ে বাটি ফিরিলেন। কৈলাসচন্দ্রের বাটিতে সে রাত্রে দুর্ভাবনায় কাহারো নিদ্রা হইল না। কৈলাসচন্দ্রকে বলিয়া সুধা ভোরের গাড়ীতে সুদর্শনকে কলিকাতা হইতে রমেশকে আনিতে পাঠাইল। কেবল একছত্র চিঠি লিখিয়া দিল, "দাদা এখনি বাড়ী এস। বড় বিপদ। সুদর্শনের মুখে সকল কথা শুনতে পাবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আসন্ন বিপদ্

দুইদিন দুর্ভাবনা, মনঃকষ্ট ও অনিদ্রার পর শেষ রাত্রে শান্তির নিদ্রা একটু আসিয়াছিল। রবিবার প্রাতে শান্তির যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। শান্তি ব্যস্তভাবে উঠিয়া দেখিল, বাটীতে আত্মীয় কুটুম্ব, বিধবা সধবা, বালক বালিকা অনেক নূতন লোক আসিয়াছে, বাহিরে গোলমাল হইতেছে। শান্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বাটীতে একটা কোন সমারোহ ক্রিয়াকাণ্ডের আয়োজন হইতেছে। কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় শান্তির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে নিকটস্থ হিন্দুস্থানী দাসীকে দিয়া নিস্তারিণীকে ডাকিয়া পাঠাইল। নিস্তারিণী আসিলে তাহাকে শান্তি দৃঢ়ভাবে বলিল, "আমাকে বাড়ীতে রেখে এস। আমি আজ এখানে কিছুতেই থাকব না!"

নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "আজ আর না, কাল একেবারে শ্বশুর ঘরে যাবে। আজ যে তোমার বিয়ে।"

উপর্য্যুপরি কঠোর আঘাতে শান্তির হৃদয় অনেকটা অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। অন্য দিন হইলে সেই কথায় সে

ক্ষোভে ও রোষে আত্মসংবরণ করিতে পারিত না। কিন্তু সে দিন সে স্থির ভাবে পুনরায় বলিল, "আমাকে রেখে এস, কেন আমাকে ভুলিয়ে এনে কষ্ট দিচ্ছ।"

নিস্তারিণী বলিল, "বিশ্বাস না কর ত আর কি করব; তোমাকে নিয়ে তা'রা আথান্তরে পড়েছিল—নইলে আজ-কালের বাজারে মেয়ের বিয়ে কি আর কেউ ইচ্ছে ক'রে ঘাড়ে নেয়? আর বাবু যে-সে সম্বন্ধ করেন নি—যখন শ্বশুরঘরে যাবে তখন টের পাবে। কার্ত্তিকের মতন বর, গাড়িঘোড়া, ধন দৌলত—রাজরাণীর মতন থাকবে। তা'রা শুনে বুকফেটে মরবে।"

শান্তি তাহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে রেখে এস—আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে বল?"

শান্তি তাহার কথায় কাণই দিতেছে না দেখিয়া নিস্তারিণী তাহার শেষ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল, "তারাও বেঁচেছে, আজকের লগ্নে শুন্‌ছি তাদেরও ছেলের বিয়ে। তাই ত বাবু জেদ ধরলেন তোমারও বিয়ে আজই দেবেন। তিনি বল্‌লেন, আমার শালীর মেয়ে কি এতই ফেল্‌না—কথা ভেঙ্গে তা'রা আগে ছেলের বিয়ে দিচ্ছে, আর মেয়েটা আইবুড় পড়ে থাকবে। তা হবে না। যত টাকা লাগে আমিও ওদের ছেলের যে লগ্নে বিয়ে হবে, সেই লগ্নেই মেয়েরও বিয়ে দেব। তাইত তাড়াতাড়ি সম্বন্ধ ঠিক করে আজই বিয়ে হচ্ছে।"

শান্তি বহুকষ্টে আত্ম-দমন করিয়াছিল, মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই শ্রান্তিতে তাহার চক্ষে জল আসিল, তাহা দেখিয়া নিস্তারিণী মনে করিল ঔষধ ধরিয়াছে। সে বলিল, "কান্না-কাটি করো না, শুভকর্ম্মে চোখের জল ফেলতে নেই।"

এই কথা বলিয়া নিস্তারিণী চলিয়া গেল।

শান্তি সেই গৃহের পশ্চাতের জানালার কাছে বসিয়া উদাসদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, নিস্তারিণী যে কথা শুনাইয়া গেল তাহা যদি সত্য হয়! নহিলে তাঁহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছেন না কেন। এ যে ইংরাজের রাজত্ব, এখানে কি কেহ অন্যায় করিয়া কাহাকেও আটক করিয়া রাখিতে পারে! জ্যেঠা মহাশয় যদি জোর করিয়া তাহাকে লইয়া যান্, তাহা হইলে ইহারা কি তাহাকে এমন করিয়া রাখিয়া দিতে পারে? ইহাদের লোকবল আছে, টাকা আছে, দ্বারবান আছে, জ্যেঠা মহাশয় কি পুলিশে খবর দিতে পারেন নাই? হয় ত ইহারা তাহাকে যেমন মিথ্যা কথা বলিয়া কাঁদাইতেছে, তেমনি তাহার নামে, তাঁহাদের কাছেও বা এমন কিছু মিথ্যা কথা বলিয়াছে, যাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন। তাই হয় ত বা তাঁহারা, তাহার উপর রাগ করিয়া অন্য জায়গায় রমেশের বিবাহ দিতেছেন। না না, তাও কি সম্ভব!—রমেশই বা সে বিবাহে সম্মত হইবে কেন? যেদিন হইতে সে শুনিয়াছে যে রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, সেইদিন হইতে যদিও সে আর রমেশের সহিত

কথা কহে নাই, তাহার সম্মুখে যায় নাই, কিন্তু হঠাৎ সম্মুখে পড়িয়া যাইলে রমেশের চকিত দৃষ্টিতে কি গভীর ভালবাসা কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিত তাহা কি সে বুঝিতে পারে নাই? ইহাদের দুইটা মিথ্যা কথায় জ্যেঠা মহাশয়, জ্যেঠাইমা, রমেশ, সুধা, রামের মা সকলে ভুলিয়া যাইবে ইহা কি সম্ভব! শান্তি স্থির করিল, ইহারা যাহা কিছু বলিয়াছে সমস্তই মিথ্যা। ছিঃ ছিঃ নিস্তারিণীর কথা কি বিশ্বাস করিতে আছে? সে কি মিথ্যা কথাগুলা অম্লানবদনে বলিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে তাহা কি শান্তির মনে নাই। সেই নিস্তারিণীর কথায় সে কি করিয়া মনে স্থান দিল যে, জ্যেঠা মহাশয়, জ্যেঠাইমা তাহাকে আপদের মত বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন! এ কথা যে সে ভ্রমেও সত্য ভাবিতে পারিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। পরক্ষণেই শান্তির মনে পড়িল, তাহার বিবাহের আয়োজনটা যে অকাট্য সত্য তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। সে কথা ত অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। সে স্থির করিল, সে কিছুতেই এ বিবাহে রাজি হইবে না। যদি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যায় সে সকলের সম্মুখে ইহাদের প্রবঞ্চনা প্রকাশ করিয়া দিবে। সে সকলের পায়ে হাতে ধরিবে—তাহাদের মধ্যে কেহ কি তাহার প্রতি দয়া করিয়া এই বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে না? শান্তির চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় সজল হইয়া আসিল—সে ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে ডাকিল, "হে মা দুর্গা! তুমি আমায় রক্ষা কর।" ভাবিয়া, কাঁদিয়া, দেবতাদের

স্মরণ করিয়া, শান্তির সেদিন প্রভাতকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধনের জ্ঞাতিদের ও বন্ধুবর্গের বাটীর কয়েকজন সধবা স্ত্রীলোক মধ্যে মধ্যে আসিয়া শান্তিকে স্নানাদি স্ত্রী-আচার করাইয়া গাত্রে হরিদ্রা স্পর্শ করাইবার জন্য, অনুরোধ ও অনুযোগ করিতে লাগিল। শান্তি তাহাদের কোন কথাই শুনিল না দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া গেল, "গিন্নিকে বল্লুম তুমি নিজে এসো—সে মেয়েকে টেনে তুলে নিয়ে গিয়ে হাড়াই ডোমাই করা আমাদের কর্ম্ম নয়। তাতে গিন্নি উত্তর দিলে কি না, কর্ত্তাকে বলগে, যে একাজে হাত দিয়েছে, সে ভুগুকগে—আমি কিছু জানিনে। তখন আর আমরা কি করবো। বিয়ের সময় বেটাছেলেরা এসে জোর করে যখন নিয়ে গিয়ে ছাঁদলাতলায় বসাবে তখন ঠিক হবে। কি একগুঁয়ে মেয়ে রে বাপু! ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, এমন হেঁদলদাকড়া মেয়ে ত বাপের কালে দেখিনি। আয় রে সব চলে আয়। থাক ও একলা বসে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধারের চেষ্টা

যে সময়ে নিস্তারিণী আসিয়া শান্তিকে তাহার নিজের বিবাহের প্রকৃত সংবাদ এবং রমেশেরও অন্যত্র বিবাহের কল্পিত সংবাদ দিয়া কাঁদাইয়া গেল, ঠিক সেই সময়ে সুদর্শন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া রমেশের হস্তে সুধার পত্র দিল। রমেশ সেই পত্র পাইয়া এবং সুদর্শনের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িল। স্থিরভাবে বিবেচনা করিবার শক্তি যেন তাহার লোপ পাইল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সেই দুঃসময়ে তাহার বসন্তের কথা অগ্রেই মনে পড়িয়া গেল। সে সুদর্শনকে সঙ্গে লইয়া বসন্তের বাড়ীতে গেল। বসন্ত অসময়ে তাহাদের দেখিয়া বিস্মিত হইল। রমেশ নীরবে সুধার পত্রখানি বসন্তের হাতে দিল। পত্র পাঠ করিয়া এবং সুদর্শনের মুখে শান্তিকে অপহরণ করিয়া লইবার কথা শুনিয়া, বসন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-সংবরণ করিয়া সে সুদর্শনকে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইল। গোবর্দ্ধনের সহিত হরিচরণ বাবুর কথোপকথনের এবং উকিল বাবুর

অভিমতের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া বসন্ত বলিল, "রমেশ, তুমি আর দেরী করো না, এখনি যাও, নইলে ১২টার ট্রেণ পাবে না। আমি পরের ট্রেণে যাচ্ছি। দেখি যদি বাবার পার্টনার্ ব্রাউটন্ সাহেবের সঙ্গে তোমাদের ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের জানা শুনা থাকে। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে চিঠি না নিয়ে গেলে বিয়ে রদ করতে পারা যাবে না, আজ কোর্ট খোলা নেই। আর রেবতীকান্তেরও শুনছি সে অঞ্চলে যে রকম প্রতিপত্তি, শুধু হাতে গেলে পুলিশে যে বিয়ে বন্ধ করতে সাহস করবে, তাও বোধ হয় না। ব্রাউটন সাহেব বেঙ্গল ক্লাবে থাকেন। সিভিলিয়ানদের অনেকেই কলিকাতা অঞ্চলে, এলে সেখানে থাকেন। এখনি বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ব্রাউটন সাহেবকে ধরতে হবে। আমার দেরী হলেও কিছু ভেবো না, আমি যাবই। তুমি কিন্তু আর দেরী করো না, এখনি বেরিয়ে পড়।"

রমেশ ও সুদর্শনকে বিদায় দিয়া বসন্ত তখনি গৌরমোহন বাবুর কাছে সমস্ত কথা বলিল। গৌরমোহন বাবু গোবর্দ্ধন ও রেবতীকান্তের চক্রান্তের কথা শুনিয়া তাহাদের উপর ঘৃণায় ও রোষে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। কৈলাসচন্দ্রের পরিবারবর্গের মনের কষ্টে তিনি ব্যথিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। বসন্তের জননী প্রভাবতীও সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "ইংরেজের মুল্লুকেও এমন অত্যাচার হচ্ছে! আর যারা এ

রকম কাজ করে তাদের জমিদার—বনেদি ঘর—এ সব কথা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না ? ছি !”

গৌরমোহন বাবু তখনি বসন্তকে সঙ্গে লইয়া ব্রাউটন্ সাহেবের কাছে গেলেন। সাহেব বলিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নাই, কিন্তু প্রেসিডেন্সী ডিভিজনের কমিশনার সাহেবের সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে। তবে সে দিন রবিবার, তাঁহার দেখা পাওয়া যাবে কিনা তাহার ঠিক নাই। সৌভাগ্যক্রমে কমিশনার সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন। ব্রাউটন্ সাহেবের অনুরোধে তিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে একখানি পরিচয়পত্র দিলেন, কিন্তু বসন্তকে সাবধান করিয়া দিলেন যে গোবর্দ্ধন কি রেবতীকান্ত যদি ইহার পরে বিবাহ বন্ধ করার জন্য ড্যামেজের নালিশ করে, তাহার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়ী থাকিবার কথা বলিতে পারেন, সে জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইও। গৌরমোহন বাবু বলিলেন “আমি জামিন্ রহিলাম, আর টাকার জামিন দরকার হয়, তাহার জন্যও বসন্ত প্রস্তুত হইয়া যাইবে।” কমিশনার সাহেব বলিলেন, টাকার দরকার হইবে না, আপনার পুত্র প্রতিভূ থাকিলেই হইবে। কমিশনার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া সকলে বিদায় লইলেন। বেলা দুইটার গাড়ীতে রমেশ হরিহর পুরে যাত্রা করিল।

এদিকে কৈলাসচন্দ্রের প্রতিবেশিগণও তাঁহার সেই বিপদের সময় নিশ্চিন্ত ছিলেন না। প্রাতঃকালেই গ্রামের

কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি মিলিয়া পলাশডাঙ্গায় যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা—রেবতীকান্তকে বুঝাইয়া এই গর্হিত কার্য্য হইতে নিরস্ত করেন। কিন্তু যাঁহারা রেবতী-কান্তকে চিনিতেন, তাঁহারা বলিলেন সে চেষ্টা করা বৃথা, কোনও ফল হইবে না। তত্রাচ গ্রামের ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও আর দুইজন প্রাচীন ব্যক্তি রেবতীকান্তের নিকট গমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রেবতীকান্ত মৌখিক ভক্তি করিত, কিন্তু এ বিষয়ে রেবতীকান্ত স্পষ্ট উত্তর দিল যে, সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম। সে বলিল, "এ যে আপনাদের অন্যায় কথা। গোবর্দ্ধন বাবুর পরিবার তাঁর বোনঝির বিবাহ দিচ্ছেন তাতে কৈলাস বাবুর কথা কইবার কি আছে? আর কি দেশে মেয়ে নেই? তিনি অন্য যায়গায় ছেলের বিয়ে দিন না? গোবর্দ্ধন বাবুর পরিবারের মনে কষ্ট দিয়ে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিলে কৈলাস বাবুর লাভ কি? আর আমি ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি, আমি প্রাণ্ থাকতে সে কথা ভাঙ্গতে পারব না—'মরদ কা বাত, হাতী কা দাঁত'—আমার যে কথা সেই কাজ। আমাকে আপনারা অন্যায় অনুরোধ করবেন না।" সেই উত্তর শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীরা বিষণ্ণবদনে ফিরিয়া আসিলেন। হরিচরণ বাবু বলিলেন, "ও যে এই রকমই জবাব দেবে তা আমরা পূর্ব্বেই জানতুম—সেইজন্য আপনা-দের পণ্ডশ্রম করতে বারণ করেছিলুম।"

রমেশ বাটীতে আসিলে তাহার সমবয়স্ক ও বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকেরা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল এবং সকলেই বলিল তাহাদের দ্বারা যদি কোনও উপকার হয় তাহা করিতে তাহারা সকলেই প্রস্তুত। রমেশ তাহাদের সহানুভূতিতে সেই নৈরাশ্যের সময় একটু সাহস পাইল এবং তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা যে কি সাহায্য হইতে পারে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যুবকদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত উদ্ধত প্রকৃতির ছিল তাহাদের মুখপাত্র হইয়া একজন বলিল, "একি মগের মুল্লুক পেয়েছে? টাকা আছে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে? রমেশ বাবু, আপনি যদি অমত করেন সেইজন্যে আমরা কিছু করতে পারছি না, নইলে এমন কি ছাদনাতলা থেকে মেয়ে কেড়ে নিয়ে আসতেও ডরাই না।" কিন্তু শান্তশিষ্ট পক্ষের একজন বিবেচক যুবক বলিল, "না হে, ও সব হাঙ্গামায় যেও না—মিছি মিছি রমেশ-দেরও বিপদে ফেল্‌বে আর নিজেরাও শেষে পুলিশের হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ হবে। রেবতীকান্ত কি গোবর্দ্ধন সে সব কথা কি আজ ভাবেনি মনে করছ? দেখে এস গে রেবতী-কান্ত জমিদারী থেকে কত ঝাঁক লাঠিয়াল এনে জড় করেছে। তাদের হাত থেকে বর ছিনিয়ে আনা তোমার আমার মতন ভদ্রঘরের ছেলেদের কাজ নয়। আর গোবর্দ্ধন এর চেয়ে বড় বড় হাঙ্গাম পুইয়ে পেকে ঝিস্কুড়্ হয়ে গেছে—সে আগে থাকতে পুলিসে খবর দিয়ে রেখেছে—আজ তিন দিন ধরে

পুলিসে তার বাড়ী আগলে পাহারা দিচ্ছে—দেউড়িতে শুনলুম ৩০।৪০ জন দরোয়ানই বল, আর গুণ্ডাই বল, দিন রাত বসে আছে। ও সব লাঠালাঠির হাঙ্গামে ভদ্রলোকের ছেলেদের যেতে আছে!"

শ্রীধর চাটুর্য্যের পুত্র হারাণ বলিল, "ওহে আমি যা বলি বরং শোন। চল রেবতীর শালা সুরেশকে গিয়ে ধরা যাক। বর যদি বেঁকে বসে তা'হলে চাই কি বিয়েটা ফেঁসে যেতে পারে।"

হারাণকে, নেশাখোর—উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া, কেহই খাতির করিত না। তাহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া হরিশ বাবুর পুত্র উমেশ বলিল, "চাইকি টাইকির কর্ম্ম নয় হে। বরই বা খামকা রাজি হতে গেল কেন?"

হারাণ বলিল, "তা কি জান, সুরেশের সঙ্গে আমার বেশ জানা-শুনো আছে। সে ইয়ার মানুষ—খোলা প্রাণ, আমরা পাঁচজনে গিয়ে যদি বলি, ওহে তোমার ক'নে আমরা যেখান থেকে হোক যোগাড় করে দেবোই, কিন্তু এ ক'নের সঙ্গে আর একজনের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে—এ ক'নেটী তোমাকে ভাই ছেড়ে দিতে হবে। সে যে রকম খামখেয়ালী খোলা মেজাজের লোক, চাই কি রাজী হলেও হতে পারে।"

সেই কথা শুনিয়া কয়েকজন যুবক হারাণের পক্ষ হইয়া বলিল, "আচ্ছা, হারাণের কথাটা শোনাই যাক্ না—ক্ষতি ত

কিছুই নেই। না হয় ফিরে আসা যাবে।" শেষে তাহাই হইল, কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া হারাণ সুরেশের নিকট গমন করিল।

সুরেশ সে দিন খুব স্ফূর্ত্তিতে ছিল। সে হারাণকে দেখিয়া বলিল, "ভায়া, নিজে যেতে পারিনি, চিঠি পাঠিয়েছি, আসা চাই।"

হারাণ বলিল, "ভাই, একটা বিপদে পড়ে এসেছি—কথাটা রাখ ত বলি।"

সুরেশ বলিল, "বল না, আগে শুনি।"

হারাণ সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল। সুরেশ নিবিষ্ট মনে হারাণের কথা শুনিল। শেষে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমাকে কি দাতাকর্ণ পেয়েছ ভায়া, না আমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করতে বসেছি। এমন ডানাকাটা পরীর মত ক'নে, তার ওপর আবার দিদির কাছে বায়না ধরেছিলুম একটা পার্টি দিতে—পাঁচশ টাকা না দিলে বিয়ে কচ্ছি না, তাতেই দিদি রাজি; তোমাদের ছুটো ফাঁকা কথায় সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব কেন বল দেখি? ছেলের হাতের মোয়া নয় দাদা, যে ধাঁ করে ভুলিয়ে নিয়ে পালাবে—সেটী হচ্ছে না। জামাইবাবু যখন তেড়ে এসে বলবেন, আমার কথা শুন্‌লি নি—আমাকে অপমান করালি, নিকাল যাও; তখন কি তোমরা এসে ম্যাও সামলাবে? তোমরা বলছ টাকা পাইয়ে দেবে, আর একটী সুন্দরী ক'নেও জুটিয়ে দেবে—তা বেশ ত,

রমেশ-বাবুরই কেন একটা ক’নে জুটিয়ে দাওগে যাও না—এ গরীবকে নিয়ে টানাটানি কেন দাদা! আর রমেশ বাবুর সঙ্গে মেয়েটীর বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছিল বল্লে—তা যদি একটু লাভ্‌ টাভ্‌ই বা হয়ে থাকে, সে সব আমি ধরছি না—আমরা নিজেই কোন্ ধর্ম্মপুত্‌তুর যুধিষ্ঠির। বলবে মেয়ে বড়সড় হয়েছে, পোষ মানবে না—সেজন্যে কিছু ভেবো না দাদা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর খোদার দেওয়া এই চেহারাখানার জোরে, সে সব কিছু আটকাবে না জেনো। ঐ দেখ বাড়ীর ভেতর থেকে দিদি ডেকে পাঠিয়েছে—আজ কি আর ফুরসৎ আছে ভায়া, কথায় বলে বর না চোর—চোরদায়ে ধরা পড়ে গেছি ভাই, কিছু মনে করোনা চল্লুম।” এই কথাগুলি মিষ্টমুখে রহস্যচ্ছলে বলিয়া সুরেশ হাসিতে হাসিতে বাটীর ভিতরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশের সেই পরিহাস-রসিকতার ভিতর যে দৃঢ়তা আছে তাহা হারাণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অগত্যা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া হারাণ ও তাহার বন্ধুদের বিদায় লইতে হইল; তাহারা ক্ষুদ্ধচিত্তে বিশুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল।

একে একে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল দেখিয়া কৈলাসচন্দ্রের পরিবারবর্গ সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল একটিমাত্র আশা তখনও ছিল, যদি বসন্ত আসিয়া কিছু করিতে পারে। সেই ক্ষীণ আশা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে মধ্যাহ্নকাল কাটাইয়া দিলেন। রবিবার বলিয়া ট্রেণের

অভাবে বসন্তের আসিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। রমেশের সঙ্গে বসন্ত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু কূলকিনারা করতে পারলে বাবা?" সুধাও তাহার লজ্জা ও সঙ্কোচ ভুলিয়া গিয়া বাটীর অপর সকলের সঙ্গে সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বসন্ত তাঁহাদের আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "আপনারা কিছু ভাববেন না, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যাচ্ছি, তাঁর কাছে থেকে হুকুম আনলে ওদের সাধ্য কি যে বিয়ে দেয়। কমিশনার সাহেব তাঁর নামে চিঠি দিয়েছেন। দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি চল্লুম, খবরটা দেওয়া দরকার বলে এদিকে একবার এলুম।"

যোগমায়া বলিলেন, "বাবা তুমি রাজা হও, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক—কি করে যে আমাদের দিনগুলো কাটছে তা হরিই জানেন!" এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে যোগমায়া প্রণত বসন্তের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বহির্ব্বাটীতে কৈলাস ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গ উদ্‌গ্রীব হইয়া সংক্ষেপে বসন্তের কথা শুনিলেন এবং পথে যদি বিপক্ষেরা গাড়ী আটক করে বা অন্য কোনও বিপদ্ হয় এই আশঙ্কায় বসন্তকে সাবধানে যাইতে উপদেশ দিলেন। জেলা-কোর্টের উকিল গদাধর চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।" বসন্ত কলিকাতা হইতে পুলিশের লোক ও দ্বারবান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সে

কৈলাসচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া উকিল বাবুকে সঙ্গে লইল। তত্রাচ গ্রামের কয়েকজন যুবক পৃথক্ গাড়ীতে—একদল বসন্তের সঙ্গে আর একদল অন্য পথে—রমেশকে সঙ্গে লইয়া সদরে যাত্রা করিল। কথা রহিল, বসন্তই ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা দূরে অপেক্ষা করিবে এবং কার্য্যসিদ্ধি হইলে রমেশকে লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিবে। বসন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ লইয়া পুলিশের লোক সঙ্গে করিয়া বিবাহ-বাড়ীতে যাইবে। ফিরিতে সম্ভবতঃ প্রহরাধিক রাত্রি হইয়া যাইবে, কিন্তু সে দিন রাত্রি ২টার পূর্ব্বে বিবাহের লগ্ন নাই—তাই রক্ষা।

কার্য্যতঃ আরও অধিক বিলম্ব হইয়া গেল। সদরে পৌছিতেই সন্ধ্যা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সবেমাত্র বাহিরে গিয়াছেন—রাত্রি ৯টা হইয়া গেল তখনও তিনি ফিরিলেন না। শেষে সংবাদ পাওয়া গেল তিনি জজ সাহেবের বাটীতে আছেন। সেখানে গিয়াও দেখা হইল না—তিনি সবে সেখান হইতে উঠিয়া বোধ হয় পুলিস সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে গিয়াছেন। এইরূপে নানাস্থানে ঘুরিয়া রাত্রি ১০টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে বসন্তের সাক্ষাৎ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি সদাশয় ব্যক্তি। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "এরূপ স্থলে বিবাহ বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া বড়ই দায়িত্বের কাজ—যাহা হউক, যখন আপনি দায়ী থাকিতে রাজী আছেন, তখন আমি আদেশ লিখিয়া দিতেছি, আর পুলিস সাহেবকেও চিঠি দিতেছি—আপনি শীঘ্রই যা'ন—পুলিশ সাহেব আপনাদের সঙ্গে লোক দিবেন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বরযাত্রী অদ্ভুত জীব !

বাদ্যভাণ্ড সহ মহাসমারোহে রাত্রি ৯টার সময় বর আসিয়া গোবর্দ্ধনের বাটীতে পৌঁছিল। সঙ্গে রেবতীকান্তের নিজের ও আত্মীয় জমিদারগণের দ্বারবানেরা আশাসোটা, নিশান বল্লম, সড়কি ধরিয়া আসিল এবং বরের চতুর্দ্দোলার অগ্রে ও পশ্চাতে বহু সংখ্যক পাইক ও লাঠিয়াল আসিল। খাসগেলাস ও রংমশালের আলোকে পল্লীপথ আলোকিত এবং রৌসন চৌকির বাদ্যে ও কলিকাতা—চুনাগলির 'গড়ের বাজনা'র শব্দে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। বহু সংখ্যক বরযাত্রী আসিল। কন্যাপক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তি গোবর্দ্ধনের বাটীতে সমবেত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া যাঁহারা বালক পাঠাইয়াও গোবর্দ্ধনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই, তাঁহারাও রেবতীকান্তের নামের মহিমায় সন্ধ্যা হইতে না হইতে সেদিন গোবর্দ্ধনের বাটীতে আসিয়া পরমাত্মীয়ের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এক্ষণে বহুসংখ্যক বরযাত্রীর আগমনে গোবর্দ্ধনের 'চকমিলান' বাটীর সুবৃহৎ উঠান এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কক্ষসমূহ ও বারান্দা লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। গোবর্দ্ধন কলিকাতার হল্‌এণ্ডার্স'নের বাটী হইতে সাজসজ্জা ও সজ্জাকর ভাড়া করিয়া আনিয়া বাটী সাজাইয়াছিল—দ্বারবানদিগের নূতন

পোষাকে সজ্জিত করিয়া দ্বারে হাজির রাখিয়াছিল। রূপার আতরদান, গোলাপপাস, পানের থালা, আড়ানি, পাথার ছড়াছড়ি করিয়াছিল এবং অভ্যাগতদিগের আহারাদির আয়োজন করিতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। সেই রঙ্গিন বস্ত্রে ও পতাকায় এবং পত্রপুষ্পে সুশোভিত, আতর গোলাপের গন্ধে আমোদিত প্রাঙ্গণে গোবর্দ্ধন পাত্রমিত্র সহ উপস্থিত থাকিয়া বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করিতে তৎপর হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন ভাবিল আজ তাহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইল—সে আজ সম্ভ্রান্ত সমাজে একটি "নাম কিনিবে।" কিন্তু বরযাত্রীদের যে বিধাতা কি উপাদানে গঠন করিয়াছেন, বরযাত্রী হইয়া যাইলে যে বিষলেশহীন ঢোঁড়া সাপও বিষধর কেউটের মতন ফণা ধরিয়া উঠে, ভিখারীও মনে করে সে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, সে বিষয়ে গোবর্দ্ধনের ভাল অভিজ্ঞতা ছিল না। অধিক রাত্রে লগ্ন বলিয়া বরকে উঠানের সিংহাসন হইতে তুলিয়া লইয়া একটী বৈঠকখানা কক্ষে সুসজ্জিত জরির কাজ-করা মখমলের বিছনায় বসাইয়া, এবং পারিষদবর্গের উপর বরযাত্রীদের খাতির যত্নের ও পরিচর্য্যার ভার দিয়া গোবর্দ্ধন উপরের ছাদে পাতা সাজাইবার তত্ত্বাবধান করিতে গেল—ইচ্ছা বিবাহের পূর্ব্বেই ভোজের কাজটা সারিয়া ফেলিবে।

গোবর্দ্ধন যাইতে না যাইতে বরযাত্রীদের মধ্য হইতে অভিযোগ অনুযোগের ছড়া উঠিতে আরম্ভ হইল। 'তামাক

দাও না গো,' 'হুঁকোটা ডাকে না যে।' 'রাম্‌ঃ! একি গোলাপজল না এঁদোপুকুরের জল ছিটুচ্ছে রে।' 'মিঠে পান জোটেনি, নতুন দিশী পানগুলো সেজে দিয়েছে ছি!' ইত্যাকার ধ্বনিতে গোবর্দ্ধনের চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ ও বহির্ব্বাটীর কক্ষসমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধনের পারিষদবর্গ সেই অসন্তোষের উচ্ছাস রোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল! এমন সময় উপর হইতে সংবাদ আসিল 'পাত হয়েছে।' গোবর্দ্ধনের প্রতিবেশী নিবারণ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বরযাত্র ব্রাহ্মণ মহাশয়রা গা তুলুন" এবং সেই সময়ে গোবর্দ্ধনের এক জ্ঞাতি ভ্রাতাও যোড়হস্তে আসিয়া ডাকিলেন, "বরযাত্র কায়স্থ মহাশয়রাও গা তুলুন।" কন্যাযাত্রীদের ক্ষুধামান্দ্য ছিল না, সুতরাং তাহারা উঠানে বসিয়া ঝাড়ের কলম গণিতে রাজি হইল না—তাহাদের অনেকেই অগ্রে উঠিয়া গিয়া বৃহৎ ছাদের উপর যে পংক্তি সাজান হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এদিকে বরযাত্রীদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকেই, কন্যাকর্ত্তা তাঁহাদের জনে জনে পৃথক্‌ভাবে ডাকিতে আসে নাই বলিয়া, বসিয়া রহিলেন। স্থানের সঙ্কুলান হইল না বলিয়া তাঁহাদের আর কেহ ডাকিতে আসিল না। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সেই সময়ে বরের পিতার স্মরণ হইল, তিনি আফিমের কৌটা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন! তাঁহার ত্রৈকালীন মৌতাতের সময় উপস্থিত। তিনি কন্যাপক্ষীয় একজনকে ডাকিয়া

বলিলেন "মশায়, একটু আফিম এনে দিতে পারেন ?" যে লোকটীকে বলা হইল সে বরের পিতাকে চিনিত না, রেবতী-কান্তকেই বরকর্ত্তা বলিয়া জানিত। সে একবার খবর লইল বাড়ীতে অহিফেন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে নিশ্চিন্ত-ভাবে বেড়াইতে দেখিয়া বরের পিতা পুনরায় বলিলেন, "মশায় কন্যাকর্তাকে বলে একটু আফিম আনিয়ে দিন।" সে উপরে গিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিল "একজন বুড়ো বরযাত্রী আফিম চাচ্ছে।" গোবর্দ্ধন বলিল, "এত রাত্রে আফিম কোথা পাব ? দেখগে যদি সিংহি মহাশয়ের কাছে কৌটো থাকে।" সে কিয়ৎক্ষণ সিংহ মহাশয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারও সাক্ষাৎ পাইল না—নিজেও আর নীচে নামিল না।

এ দিকে বরের বন্ধুবর্গ বিবাহের পর তাহার সহিত একত্রে ভোজন করিবে বলিয়া বরকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। সেই কক্ষে গোবর্দ্ধনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীনিবাসকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বরের একজন বন্ধু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে ভায়া! শোন ত একটা কথা—বলি শুকনো মুখে কাঁহাতক বসে থাকব, তেষ্টা পেয়ে গেল যে—বোতল-টোতল আছে ?" শ্রীনিবাস বরের ঐ বন্ধু বাবুটিকে চিনিত। বাবুটি একবার তাহাদের গ্রামে সখের থিয়েটার করিতে গিয়া গ্রীণ্ রুমে আকণ্ঠ কারণবারি পান করিয়া (বাবুটি কাপালিক সাজিয়াছিলেন !) রঙ্গমঞ্চে আসিয়া রসোদ্গার করেন ; ফলে সে রাত্রে কপালকুণ্ডলার অভিনয় দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। শ্রীনিবাস

দেখিল বাবুটীর কথা না রাখিলে, সে দিনও হয়ত তিনি একটা কিছু বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া বসিবেন। কাজেই শ্রীনিবাস "দেখি মশায়" বলিয়া মদ্যের সন্ধানে তৎপর হইল এবং বহু অনুসন্ধানের পর গোবর্দ্ধনের এক পারিষদের নিকট হইতে এক বোতল দেশী মদ্য লইয়া গিয়া হাজির করিল। তাহা দেখিয়া রেবতীকান্তের এক ভাগিনেয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে বাড়ী হইতেই একটু তৈয়ার হইয়া আসিয়াছিল ; সে বোতলটী ঘুরাইয়া উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "বাহবা বাহবা ! একি দেশী গ্রিন্ সিল্ না হোয়াইট্ হর্স ! বাবা একি বাজন্দার বিদেয় পেয়েছ ? আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, তেষ্টা পেয়েছে বল্লুম— তুমি কি না ধানেশ্বরী এনে হাজির করলে, ছো ছো ! সুরো তোর এ বিয়ে বিয়েই নয়—এ নিরমিষ্যি বিয়ে—নিকে ! তোর আমরা আবার বিয়ে দেবো !" সেই সময়ে ছাদের উপর হইতে একটা উচ্চ কোলাহল উঠিল, সকলে ব্যাপার কি জানিবার জন্য কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে ছাদের উপর ভোজন করিতে বসিয়া বরযাত্রীর দল প্রথম হইতেই ত্রুটী আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল, "এ কি লুচি বাবা, এ যে জুতোর শুকতলা— ঠাণ্ডা হয়ে পান্তভাত হয়ে গেছে যে, এ কি মানুষে খেতে পারে ?" গোবর্দ্ধনের পারিষদেরা ভদ্রতার ধার ধারে না, বাবুর ধনগর্ব্বে তাহারা বাবু অপেক্ষা শতগুণে গর্ব্বিত। তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল "খান্ না মশায়—বেশী কপ্-

চাচ্ছেন কেন ? বাড়ীতে ত পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কড়কড়ে ভাত—বদনে তুলে দিন, দুপিঠ ভাজা আছে, বেশ লাগবে এখন।" সেই সময়ে আর একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল "কৈ মশায়, আলুর দমটা এলো না—সমস্ত রাত্তির হত্যে দিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি ?" গোবর্দ্ধনের আর একজন পারিষদ উত্তর দিল, "আলুর দমের জন্যে হেদাচ্ছেন কেন মশায়, আরও পঁচিশ রকম তরকারি রয়েছে, ততক্ষণ খান্ না, আলুর দম আস্‌ছে।" গোবর্দ্ধনের অন্তরঙ্গ, আমাদের পূর্ব্বকথিত রায় মহাশয় সেই উক্তিতে যোগ দিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না মশায়, রকম আছে। গোবর্দ্ধন বাবু যে রকম আয়োজন করেছেন তা এ তল্লাটে আর কাউকে কর্ত্তে হবে না—কেষ্ট-নগরের সরভাজা সরপুরিয়া, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, জনাইএর মনোহরা, মল্লারচকের দধি—যেখানে যে জিনিসটী ভাল পাওয়া যায়, সমস্ত আনিয়েছেন। বসে খান মশায়, সবুরে মেওয়া ফলবে !" এই কথা বলিয়া রায় মহাশয় যেমন পশ্চাৎ ফিরিলেন, অমনি একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল "বেটা আদেখ্‌লের পুতের জাঁকটা শুনলি ত হাব্‌লা ? শালারা কখনো বাড়ীতে পাত পাড়ায় নি ত, তাই এইতেই ধরাখানা যেন সরা দেখছে। রেবতী বাবুর সেই ছেলের অন্নপ্রাশনের খাওয়ানটা যদি দেখতো—হাত বাড়িয়া খুরি সরা ডিসের নাগাল পাওয়া যায় না, মনে আছে ত ?" সম্বোধিত 'হাব্‌লা' উত্তর দিল, "আরে কিসে আর কিসে ! রেবতী বাবুরা

হ'ল সাতপুরুষে বড়লোক, বড় ঘরোয়ানার চালচলন, এ আধুনিকেরা জানবে কি করে।"

রায় মহাশয়ের কর্ণে সেই কথা প্রবেশ করিতেই, রায় মশায় মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, "আরে যাও যাও, ঢের ঢের বনেদি দেখা আছে, বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন—কেবল ভড়ং—ভেতরে ঢুঁ ঢুঁ।"

এমন সময় আর একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল, মশায়, ঝগড়া রাখুন, সরপুরিয়া আর রাবড়ি আনান্ দেখি।"

রায় মহাশয়ের মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি উত্তর দিলেন, "লুচি খাচ্চেন, লুচি তরকারি খান্ না, এর মধ্যে রাবড়ির খোঁজ কেন?"

প্রত্যুত্তর হইল, "ইনি লুচি-টুচি খান্ না—সেরেফ সর-পুরিয়া আর রাবড়ি খাবেন।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "খালি মিষ্টি খাবেন না মহশায়, নেশা ছুটে যাবে।"

যিনি কেবল রাবড়ি ও সরপুরিয়া খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিও একজন প্রাচীন অহিফেনসেবী—বরের মাতুল; বর যেমন ভগ্নীপতির আশ্রয়ে আছে, সেই মাতুলটিও তেমনি অবস্থাবিপাকে পড়িয়া বরের পিতার স্কন্ধে ভর দিয়া আছেন। দুঃখে পড়িয়া তাহার অভিমান প্রখর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ক্রি—ই—ই! আমায় বলে কি না নেশাখোর? যত বড় মুখ তত বড় কথা?" সেই

সময়ে বরের পিতা অহিফেনের মৌতাতের সময় বহুক্ষণ অতীত হইয়া যাওয়াতে ক্রোধ-কম্পান্বিত কলেবরে সেই স্থানে আসিয়া জরা-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "কোথা গেলে রেবতীকান্ত—ওহে রেবতীকান্ত ! এমন্ ছোট লোকের বাড়ীতে কাজ করলে, খাতির যত্ন চুলোয় গেল একবার ডেকে জিজ্ঞেসও করে না।"

বরের মাতুলও সুযোগ বুঝিয়া সেই সময়ে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া ভগ্নিপতিকে শুনাইয়া বলিল, "আমাকে কি না নেশাখোর-টেশাখোর যাচ্ছেতাই বলে অপমান কর্লে—আমি আর এখানে জলগ্রহণ করবো না, আমি এই উঠলাম।" অপর দুই একজন ব্যক্তি "হাঁ, হাঁ, করেন কি ! উঠবেন না মশায়" বলিতে না বলিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বরের পিতা হাঁকিলেন, "কে বলে তোমায় এতবড় কথা বল ত তাকে দেখি ? তুমি উঠে এস !"

সেই সময়ে গোবর্দ্ধন সেই গণ্ডগোল শুনিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে মশায় ? অত হাঁকাহাঁকি কেন ?" বরের পিতার সহিত গোবর্দ্ধনের পরিচয় ছিল না, বৃদ্ধ বলিলেন, "হবে আর কি, ছোটলোকের বাড়ী এসে ঝক্-মারি।" গোবর্দ্ধন সেদিন অজস্র ব্যয় করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই গরিমায় আঘাত লাগাতে, সে আত্ম-দমন করিতে অক্ষম হইয়া উত্তর দিল, "মুখ সাম্লে কথা ক'বেন, মশায়, নিজে ছোটলোক না হ'লে—"

বরের পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে যাও যাও, ছোট লোকের মত কাজ করলে ছোট লোক বলবে না, হাজার বার বলবো। বেটারা মানুষ বেচে খায়—তা ভদ্দর লোকের খাতির জানবে কি ?"

গোবর্দ্ধনের মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগাতে সে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল "খবরদার, ফের ও কথা বলবেন ত অপমান হবেন !" সেই বাক্‌যুদ্ধের সময় রেবতীকান্ত সেখানে আসিয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বরের মাতুল বলিলেন, "আমাদের এখানে এনে দাঁড়িয়ে অপমান করালে বাবা ?"

বরের পিতা এতক্ষণে জামাতাকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিলেন, "আমি এই চল্লুম, বিয়ে দিতে হয়, তুমি দাওগে।"

রেবতীকান্ত তাহাদের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া গোবর্দ্ধনকে কঠোরস্বরে বলিল, "কি ? ভারি লম্বা চওড়া কথা কইছ যে দেখছি—কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে, না ?"

গোবর্দ্ধনের তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না ; সেও সমান ভাবে উত্তর দিল, "মুখ সামলে কথা কবেন—এ প্রজার বাড়ী পান্‌নি যে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভিটেয় ঘুঘু চরাবেন, গোবর্দ্ধন দত্ত কাকেও ডরায় না, জান্‌বেন।"

রেবতীকান্ত বজ্রধ্বনিতে উত্তর দিল, "বাস্ বাস্। উঠে এস সব—বর নিয়ে চলে এস।"

পূর্ব্ব হইতেই বরযাত্রীদের রোষ জ্বলনোন্মুখ হইয়াছিল। রেবতীকান্তের আদেশে বারুদের স্তূপে আগুন লাগিল। ভোক্তার দল হৈ হৈ শব্দে উঠিয়া পড়িল। নীচের উঠানে বরের বন্ধুবর্গ বরকে লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই গোবর্দ্ধন হাঁকিল, খবরদার্ বরকো মৎ ছোড়ো—কেয়াড়ি বন্দ্ কর্ দেও।"

রেবতীকান্তও হুকুম দিলেন, "লাগাও শালা লোগ কো।" রেবতীকান্তের জমিদারীর পাইক ও লাঠিয়ালগণ হুহুঙ্কার শব্দে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। গোবর্দ্ধনের আড়কাঠি বা দ্বারবানেরা গুণ্ডামিতে পটু, কিন্তু শিক্ষিত লাঠিয়ালদের লাঠির সম্মুখে অগ্রসর হইতে তাহারা সাহস করিল না, লাঠিয়ালেরা ঝাড়, লণ্ঠন, চেয়ার, ছবি ভাঙ্গিয়া, গোবর্দ্ধনের দ্বারবানদের যাহাদের সম্মুখে পাইল তাহাদের জখম করিয়া, বর ও বরযাত্রীদের লইয়া, লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, হুহুঙ্কার শব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত গাড়ি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ-পত্র হস্তে গোবর্দ্ধনের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিবাহ-সভা কিষ্কিন্ধ্যায় রূপান্তরিত হইয়াছে; পুলিস আসিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছে।

বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বর চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বসন্ত নিশ্চিন্ত হইল এবং যে সাব্-ইনস্পেক্টরকে সদর হইতে পুলিস সাহেব সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিল;

পরে রমেশের যে সকল প্রতিবেশী বন্ধুবর্গ স্বতন্ত্র গাড়িতে আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত হরিহরপুরে রাত্রি দুইটার পর গিয়া পৌঁছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হরিষে বিষাদ

শান্তি সমস্ত দিন মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই। রাত্রি হইলে তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল গোবর্দ্ধনের যমদূতগণ কখন আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া 'ছাদলাতলায়' টানিয়া লইয়া যায়। বহির্ব্বাটী হইতে মধ্যে মধ্যে নহবতের শব্দ আসিতেছিল। সেই বাদ্যধ্বনিতে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সানাইয়ের সাহানা আলাপ, তাহার কর্ণে যেন মৃত্যুর আর্ত্তনাদ বলিয়া বোধ হইতেছিল। যখন বাদ্যধ্বনি করিয়া বর আসিল, এবং বহির্ব্বাটীতে উৎসবের কলরব উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল, তখন আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে যেন জ্ঞানহারা করিয়া ফেলিল. দীর্ঘকাল-ব্যাপী কঠোর মানসিক উত্তেজনায় এবং অনাহারজনিত শারীরিক অবসাদে সে অর্দ্ধমৃতার মতন হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে যখন বাহির হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার উচ্চ কোলাহল উঠিল এবং সকলে তাহাকে ফেলিয়া ছুটিয়া গেল, তাহার একবার মনে হইল যে, সেই সুযোগে সে পলাইয়া যায়; কিন্তু অন্ধকারময় রাত্রিকালে, কি করিয়া সে সেই অপরিচিত অট্টালিকায় বহির্গমনের পথের সন্ধান পাইবে এবং বাহিরে

গিয়াই বা একাকী কি করিবে? আর, পরে লোকেই বা কি বলিবে? তাহার শরীরেও পলাইবার শক্তি ছিল না। সে উঠিয়া বসিতে গিয়া পড়িয়া গেল, তাহার মস্তক ঘুরিতে ছিল। অল্পক্ষণ পরেই—তাহার শরীর-রক্ষিকা হিন্দুস্থানী দাসীদ্বয়ের ফিরিবার পূর্ব্বেই—নীরদা দাসী দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে খবর দিল, "বরযাত্রীদের সঙ্গে মারামারি হচ্ছিল, তারা বর নিয়ে চলে গেছে—আজ আর তোমার কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। এই গোটাকতক সন্দেশ লুকিয়ে এনেছি—এই ক'টা খেয়ে জল খাও।"

সেই সুসংবাদে শান্তির চক্ষে জল আসিল, কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল—সে নীরদার হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে?"

নীরদা ভীতা হইয়া বলিল, "বাড়ীর চারিদিকে পাহারা, বেরুবার যো নেই—আর আমিও নতুন লোক, গ্রামের পথঘাট চিনিনে। এ যাত্রা ত বিয়ের হাত থেকে বেঁচে গেলে। কাল চৈত মাস পড়বে আর বিয়ের লগ্ন নেই—তবে আর ভাবনা কি? এখন একটু কিছু খাও, নইলে কাল উঠতে পারবে না। আমি ওদের ভয়ে কাছে আসতে পারিনি—কিছু মনে করো না—তোমাদের বাড়ীর লোকেরা আসা যাওয়া কর্‌ছেন, তাঁরাই তোমাকে নিয়ে যাবেন, তুমি সে সব কথা এখন ভেবো না। নাও, আমার মাথা খাও, সন্দেশ ক'টা খেয়ে একটু জল খাও।" অকৃতজ্ঞ ভাবিবে ভাবিয়া শান্তি সন্দেশ কয়টা

গলাধঃকরণ করিয়া জল খাইল। নীরদা বলিল, "আমি চল্লুম —এখনি মাগীরা এসে পড়বে—তোমার কাছে এসেছি জানলে, নিস্তারিণী রক্ষে রাখ্‌বে না।" নীরদা চলিয়া গেল। শান্তি পুনরায় সেখানে শুইয়া পড়িল এবং ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সে শুনিতে পাইল, তাহার কক্ষের সম্মুখে ছাদের উপর তাহার মাসীর সহিত গোবর্দ্ধনের তুমুল কলহ বাধিয়াছে। গোবর্দ্ধন বলিতেছে, "হতচ্ছাড়া মেয়েটার জন্যে আমার নাহক কতকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। বিয়ে করতে এসে বর ফিরে গেল, এমনি অপয়া মেয়ে! ও দোপড়া মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কি আমি ফ্যাঁসাদে পড়ে যাব? একে ত রেবতীকান্ত শালা শাসিয়ে গেছে কেমন কোরে আমি ঐ মেয়ের বিয়ে দিই দেখে নেবে! এখন ও মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই একটা ছুতো পেয়ে এখনি দলাদলিটে প্যাকিয়ে তুলবে। ও মেয়েকে এখনি বিদেয় করে দাও।"

শ্যামা বলিতেছে, "পাঠাতে হয় পাঠাবে, রাখতে হয় রাখবে; তার আমি কি জানি? আমি কি তোমার হাতে ধরে সেধেছিলুম, ওগো আমার বোনঝিকে নিয়ে এসে আমায় চোদ্দপুরুষ উদ্ধার কর। তুমি এনেছ, তুমি বোঝগে। আর পাঠাবেই বা কোথায়?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "কেন, যেখান থেকে এনেছি—সেই কৈলেস ঘোষের বাড়ীতেই পাঠিয়ে দেব।"

শ্যামা বলিল, "হ্যাঁ, তা দেবে বৈকি! নিজে দোপড়া মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না—কৈলেস ঘোষ তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জাতে ঠেলা হয়ে থাক। তার আর নিজের মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে না–না?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তা সে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে না দেয়, আর কোথাও একটা গরিব-দুঃখীর ছেলে-টেলে খুঁজে বিয়ে দিকৃগে, টাকার লোভ দেখালে কি আর একটা বর জুটবে না? আমি না হয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করবো। কিন্তু ও মেয়েকে আর আমি কিছুতেই বাড়ীতে রাখছি না, একেত রেবতীকান্তটার পরামর্শ শুনে মেয়েটাকে এনে বনিদিদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারা চুলোয় গেল—যেমন প্যাঁজ পয়জার হতে হয় তা হলো—শেষে শালা আবার কি একটা ফ্যাঁসাদে ফেলবে? দাও ওকে এখনি বিদেয় করে দাও।"

শ্যামা বলিল, "আমিত বলেছি, আমাকে আর ওসব কথা কিছু বলো না। ওর যাহোক একটা কিনারা হয়েছিল—ওকে শুধু শুধু এনে কেন জলে ভাসিয়ে দিতে বসেছ বল দিকি? আমাকে আর যদি ও কথা বলবে ত আমি অনর্থ করবো।"

এই কথা বলিয়া শ্যামা সেখান হইতে চলিয়া গেল—গোবর্দ্ধনও তাহার অনুগমন করিল।

সেই কথোপকথন শুনিয়া শান্তি বুঝিতে পারিল,

নিস্তারিণী যে রমেশের বিবাহের কথা বলিয়াছিল তাহা সমস্তই অলীক, সেই সংবাদে শান্তির মনের ভাব একদিকে লাঘব হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে গোবর্দ্ধন যে দোপড়া মেয়ের কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া শান্তির চক্ষুস্থির হইয়া গেল। কি ভয়ানক কথা! সত্য সত্যই কি সে 'দোপড়া' হইয়া গিয়াছে—তাহাকে লইয়া জ্যেঠামহাশয় বিভ্রাটে পড়িবেন? সুধার বিবাহ দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে? শান্তি ভাবিল, সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সে-ই বা কি করিয়া জ্যেঠা মহাশয়ের বাটী গিয়া মুখ দেখাইবে। তাঁহারা যদি স্নেহের বশীভূত হইয়া রমেশের সহিত এখনো তাহার বিবাহ দিতে রাজি হয়েন, শান্তি নিজে কি করিয়া জানিয়া শুনিয়া রমেশের জীবনে এবং তাহার জ্যেঠা মহাশয় ও জ্যেঠাইমার নিষ্কলঙ্ক সংসারে একটা দুরপনেয় কলঙ্কের দাগ টানিয়া দিবে। তাঁহাদের অপার স্নেহের, শেষে কি শান্তি এই প্রতিদান দিবে? সে স্থির করিল, তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হউক; কিন্তু সে কিছুতেই সেই কলঙ্কের পশরা লইয়া গিয়া জ্যেঠা মহাশয়ের পবিত্রগৃহে নামাইবে না। ইহাদের কথায় বুঝা যাইতেছে যে কোন গরিব-দুঃখী পাত্রও সহজে তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে না—আর রূপে গুণে বিদ্যায় ভূষিত রমেশ কি সেই পথের ভিখারীদের চেয়েও দুর্ভাগ্য যে, তাহাকে বিবাহ করিয়া সে সমাজের হেয় হইয়া থাকিবে,

এবং শান্তি নিজের সুখের জন্য তাহাই করিতে দিবে? সে কি এতই অকৃতজ্ঞ? ভাবিতে ভাবিতে মর্ম্মান্তিক দুঃখে শান্তির বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে ভাবিল, মা দুর্গা! এ আবার কি করিলে—এক মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া আবার আমাকে কেন এমন ভয়ানক বিপদে ফেলিলে? সে কক্ষতলে পড়িয়া অনেকক্ষণ গুমরিয়া কাঁদিল, শেষে সে নিজের একটা পন্থা স্থির করিয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া উঠিয়া বসিল।

প্রহরেক পরে নিস্তারিণী অসিয়া যখন তাহাকে বলিল চল, "তোমাকে রেখে আসি।"

শান্তি প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রেখে আস্‌বে?"

নিস্তারিণী বলিল, যেখান থেকে এনেছি, সেইখানে রেখে আস্‌ব— কৈলেস বাবুর বাড়ী, আবার কোথা!"

শান্তি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "আমি সেখানে যাব না।"

নিস্তারিণী বলিল, "যাবে না ত এখানে থেকে কি বাবুকে মজাবে? কৈলেস বাবুরা তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য হাঁপাচ্ছিল —এইবার যাক্‌না নিয়ে?"

শান্তি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি এখানে থাকতে চাইনি, কিন্তু সেখানেও যাব না। আমার বাড়ীতে আমাকে রেখে এস।"

নিস্তারিণী বলিল, সেই তাদের পাশের পোড়ো বাড়ীটায়?

সেখানে সেই বুড়ী রামের মা মাগী থাকে বটে। তা চল তোমাকে সেইখানেই রেখে আসি।”

এই কথা বলিয়া নিস্তারিণী চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একাকী আসিয়া বলিল, “এস গো—এস”। শান্তি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত তাহার অনুগমন করিল। শ্যামা কি গোবর্দ্ধন কিংবা বাটীর অপর কেহ শান্তিকে বিদায়সম্ভাষণ করিতে আসিল না। শান্তিরও তাহার মাসীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। কেবল দূর হইতে নীরদা দাসী করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে বিদায়-অভিবাদন করিল। শান্তি তাহা লক্ষ্য করিল না—সে যেন তৎকালে যমপুরী ত্যাগ করিয়া যাইতেছে—অথচ সেই নিষ্কৃতি-জনিত হর্ষের কোন চিহ্নই শান্তির মুখাবয়বে দেখা যাইতেছিল না। সে উদাস নয়নে, বিষন্ন বদনে, আনত আননে গিয়া পাল্কীতে উঠিয়া বসিল। নিস্তারিণী পাল্কীর সঙ্গে গেল এবং হরিহরপুরে পৌঁছিয়া পাল্কী-বেহারাদের দূর হইতে হরনাথের পরিত্যক্ত বাটী দেখাইয়া দিল। তাহারা শান্তিকে সেই বাটীর দ্বারে নামাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল।

তখন বেলা দশটা হইবে। কৈলাসচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। বসন্তও আহারাদি করিয়া উকিল গদাধর বাবুর সঙ্গে সদরে গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ দিয়া আসিবে এবং তাঁহার আদেশ-পত্র রাত্রে ব্যবহার করিতে হয় নাই—সে সকল কথা নিজমুখে জানাইয়া আসিবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইহাও বলিয়া আসিবে যে, যদি গোবর্দ্ধন এক্ষণে

স্বইচ্ছায় শাস্তিকে পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করিবে। কৈলাস বাবুও কলিকাতায় সে বিষয়ে ব্যবহারাজীবদিগের পরামর্শ লইয়া বৈকালে আবার বাটীতে আসিবেন এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। বসন্ত বলিয়া গিয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে আসিয়া, কৈলাস বাবুর পক্ষ হইতে সে আর একবার হরিচরণ বাবুর সঙ্গে গিয়া, গোবর্দ্ধনের সহিত দেখা করিবে এবং শাস্তিকে সহমানে পাঠাইবার কথা বলিয়া দেখিবে। গদাধর বাবুও সঙ্গে যাইবেন গোবর্দ্ধন কি উত্তর দেয় তাহা শুনিয়া আসিবেন।

শাস্তি যখন তাহার পিতৃভবনে প্রবেশ করিল তখন কৈলাস বাবুর বাটীতে রমেশ উপস্থিত ছিল। কিন্তু বেহারারা নিঃশব্দে পাল্কী লইয়া গিয়াছিল বলিয়া শাস্তির আগমনের কথা কেহই জানিতে পারিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্নেহের বন্ধন

পাল্কী হইতে নামিয়া শান্তি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল বাটীতে কেহ নাই। বুধী গাভীর বাছুরটি উঠানে বাঁধা রহিয়াছে; রামের মা তখন কৈলাসচন্দ্রের বাটীতে আহারাদি করিতে গিয়াছে। শান্তি রামের মার গৃহে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। রামের মা আহারাদি করিয়া আসিয়া দেখে তাহার তক্তপোষে কে উপুড় হইয়া শয়ন করিয়া আছে। সে চমকিয়া উঠিয়া "কে—গা!" বলিয়া নিকটে আসিয়া দেখে শান্তি। রামের মা বিস্ময়ে যেন আকাশ হইতে পড়িল—সে বলিল, "একি! খুকি! এখানে কি করে এ'লি দিদি? পালিয়ে এসেছিস্, বেশ্ করেছিস্। যাই জ্যেঠাইমাকে ডেকে আনি।"

রামের মা বাড়ীর ভিতরের পথ দিয়া যোগমায়াকে ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি তাহার কাপড় ধরিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না বুড়োদিদি—যাস্ নি।"

রামের মা বলিল, "সে কি! জ্যেঠাইমাকে খবর দেব না? তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন—খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে হা পিত্তেস্ করে বসে আছেন, তাঁর কাছে যাব না?"

শান্তি বলিল, "না বুড়োদিদি যাস্‌নি, আমি এইখানে থাকব—জ্যেঠাইমাদের বাড়ী যাব না।"

রামের মা বিস্ময়ের সহিত বলিল, "ওমা, এ আবার কি কথা! এখানে কার কাছে থাকবি?"

শান্তি বলিল, "তোর কাছে থাকব বুড়োদিদি—তুই আর আমি থাকব।"

রামের মা বলিল, "সে আবার কি কথা? দেখি দেখি বাছার আমার চেহারা কি হয়ে গেছে—একেবারে চেনা যায় না, এ কি হয়ে গেছিস্! মড়ারা কি খেতে দেয়নি? জোর করে গায় হলুদ দিয়েছিল, বিয়ে ত আর দিতে পারেনি—শুনলুম ছাঁদলাতলা থেকে বর ফিরে গেছে—আপদ গেছে; তবে আর কান্না কেন?"

শান্তি বলিল, "সে জন্যে নয় বুড়োদিদি, গায়ে হলুদও হয়নি, বর ছাঁদলাতলাতেও যায়নি—আর, আর আমিও পালিয়ে আসিনি—"

রামের মা বাধা দিয়া বলিল, "তবে কাঁদছিস্ কেন বাছা?"

শান্তি বলিল, "দোপড়া মেয়ের বিয়ে হবে না, বলে তারা আমাকে বিদেয় করে দিয়েছে। জ্যেঠাইমাদের গলায় ফেলে দিয়ে, তাঁদের মজাতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি বলে, এখানে রেখে গেছে।"

রামের মা বলিল, "তা বেশ করেছে—চল এখন জ্যেঠাইমাদের বাড়ী, এর আবার মজান কি?"

শান্তি বলিল, "তুই বুঝিস্নি বুড়োদিদি আমাকে ঘরে

রাখলে সুধার বিয়ে হবে না—জাতে ঠেল্‌বে। ওঁদের আর কেন বিপদে ফেল্‌ব বুড়োদিদি, নিজের কপালে কষ্ট আছে, নিজেই ভোগ করি। তুই ত আর ফেল্‌তে পার্‌বি নি—আমি এইখানেই থাক্‌ব।"

রামের মা বলিল, "কে তোকে এ সব কথা বলেছে বল ত? সেই পোড়ার-মুখোদের কথা আবার শোনে। যাই দিকি জ্যেঠাইমার কাছে—কি বলে।"

শান্তি বলিল, "তোর পায়ে পড়ি বুড়োদিদি যাস্‌নি, আমার জন্যে ওঁরা ঢের সয়েছেন—অনেক কষ্ট পেয়েছেন; আবার যদি ওঁদের আমার জন্যে অপমান লাঞ্ছনা সইতে হয়, তা আর আমি দেখতে পার্‌ব না।" এই কথা বলিতে গিয়া শান্তি ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রামের মা তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিল, "লক্ষ্মী দিদি আমার কেঁদনা, জ্যেঠাইমা কান্নাকাটি কচ্ছেন—সুধা মুখ শুকিয়ে যেন কেমনতর হয়ে রয়েছে, জ্যেঠা মশায়, দাদা বাবু, বসন্ত বাবু, তোমাকে আন্‌বার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে—তাদের খবরটা দিয়ে আসি ধন, তাদের ভাবনাটা যাক্। আমি এখনি আস্‌ছি।" দারুণ দুঃখ ও উত্তেজনার পর শান্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সে আর কিছু বলিল না—নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

রামের মা দ্রুতপদে গিয়া যোগমায়াকে সংবাদ দিল, "জ্যেঠাইমা, খুকি এসেছে।"

রামের মার উচ্চকণ্ঠস্বর শুনিয়া যোগমায়া, সুধা, রমেশ সকলেই ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া আসিল। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ ? কোথায় ?"

রামের মা বলিল, "ও বাড়ীতে আছে।"

যোগমায়া বলিল, "ও বাড়ীতে ! এখানে আন্‌লে না কেন ? লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে বুঝি, তাই লজ্জা হয়েছে—চল আমি যাচ্ছি।

রামের মা বলিল, "না গো তারাই পাল্কী করে দিয়ে গেছে।" তোমাদের এখানেই রেখে যেতে চেয়েছিল—তোমরা জাতে ঠেলা হবে সেই ভয়ে সে নিজেই আসেনি। তারা নাকি বলেছে, সে 'দোপড়া' হয়ে গিয়েছে—শুনলুম পাকা দেখা হয়নি, গায়ে হলুদও হয়নি, বর কেমন তা সে চোখেও দেখেনি—তবু বর বিয়ে করতে এসে ফিরে গেছে বলে সে নাকি 'দোপড়া' হয়ে গেছে !"

রমেশ বলিয়া উঠিল, "ক্ষেপা আর কি !"

যোগমায়াও বলিলেন, "ক্ষেপা না ক্ষেপা ! চল আমি যাচ্ছি, গিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ছি।" এই কথা বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরের দ্বার দিয়া শান্তিদের বাড়ীতে চলিলেন, সুধা ও রামের মাও সঙ্গে সঙ্গে যাইল।

রামের মার তক্তপোষে শান্তি তখনও উপুড় হইয়া শুইয়া

বসনাঞ্চল অশ্রুসিক্ত করিতেছিল। যোগমায়া গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন এবং তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাছা আমার রে, দুদিনে মার আমার সোণার বরণ কালী হয়ে গেছে—কেঁদে কেঁদে চোখ বসে গেছে—এত কষ্টও তোমার কপালে ছিল!"

যোগমায়ার সেই স্নেহোচ্ছ্বাসে শান্তির গণ্ডদ্বয় বহিয়া পুনরায় দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। যোগমায়া নিজ অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "আর কান্না কেন মা! আমার হারান মাণিককে ফিরে পেয়েছি, আর কি বুক থেকে ছাড়বো? আজ সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা বাড়ীতে আসবেন—আর যাতে বাছাকে আমার কেউ না কেড়ে নিয়ে যেতে পারে তার বিহিত তাঁকে আগে করতে বলব। বৈশাখ মাস পড়লেই বিয়ে দেব। ক্ষেপা মেয়ে, আমার বুকটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে আর তুমি এখানে এসে পড়ে আছ? ভাগ্যি রামের মা এসেছিল! তারা বলেছে, লোকে একঘরে করবে? কেন? আর, একঘরে যদি হতে হয় তোকে নিয়ে একঘরে হব—আয় মা আয়।"

যোগমায়ার স্নেহধারায় শান্তির মনের বল ভাসিয়া গেল, সে তাহার ভ্রম বুঝিল—সে যে যোগমায়ার এই অপার স্নেহকে উপেক্ষা করিয়া বৃথা যুক্তি তর্কে তাঁহাদের পর ভাবিতে পারিয়াছিল সেই অনুতাপে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। সে

নীরবে সুধার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অধোবদনে যোগমায়ার অনুগমন করিল।

বেলা তিনটার সময় সদর হইতে বসন্ত ফিরিয়া আসিল এবং শান্তিকে গোবর্দ্ধনেরা নিজেরাই রাখিয়া গিয়াছে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে যোগমায়ার কাছে গিয়া যখন শান্তির বাটীতে আসিবার সঙ্কোচ ও ভয়ের কথা শুনিল, সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ছেলে মানুষ যে কষ্ট পেয়েছে, তা'তে আর কি মাথার ঠিক থাকে। সে যাক্, এখন রমেশের বিয়ের যোগাড়টা করে ফেলুন—আর দেরী করবেন না।"

যোগমায়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, সে কথা আর বলতে, তবে ইচ্ছে ছিল সুধারও এক সঙ্গেই বিয়ে দিই—তা না হয় পরেই হবে।" এই কথা বলিয়া যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; এই জাতেঠেলার ব্যাপার লইয়া যদি বসন্তর পিতা সুধার সহিত বিবাহ দিতে কোন আপত্তি করেন, সেই ভয়ে যোগমায়ার মুখ মলিন হইয়া গেল।

বসন্ত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "তা যদি ইচ্ছে থাকে, তাই বা হবে না কেন? সমস্ত চৈত্র মাসটা হাতে রয়েছে। যা তা একটা হুজুগ করে একঘরে করার ঘোঁটের কথা কিছু ভাববেন না, ওসব কথা কলকাতার লোকে গ্রাহ্যও করে না—আপনাদের পল্লীগ্রামের লোকেরাই এখন ওসব ওজর বড় বাছে! আমি

আজ আসি, কাল আবার এসে সদরে যেতে হ'ত—সে দায় থেকে এড়িয়ে যে কি আহ্লাদ হচ্ছে তা বল্‌তে পারছি না।"

পরে রমেশের কাছে গিয়া বিদায় লইবার সময় বসন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভায়া, বিয়ের যোগাড়টা যাতে শীগ্‌গির হয়, তার বন্দোবস্ত করে এলুম—এখন নিজের অহ্লোদে গরীব যে কথাটা সেবার বলে গিয়েছিল, সেটা যেন ভুলে যেও না।"

রমেশ আবেগের সহিত গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "সেটা যে তোমার চেয়েও আমাদের বেশী সুখের কথা ভাই—সে কি ভোল্‌বাব। তুমি বারণ করেছিলে বলেই চুপ করে ছিলুম।"

বসন্ত বলিল, "এখন বলতে পার; বলাটা দরকার হয়ে পড়েছে। আমি কথাটা মার কাছে পেড়ে রেখেছি—তিনিও বোধ হয় বাবাকে বলেছেন।"

রমেশ বলিল, "তা হ'লে যদি দরকার হয় আমি কালই গিয়ে তোমার বাবার কাছে কথাটা পাড়ব।"

বসন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। রাত্রে কৈলাসচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া শান্তিকে দেখিয়া এই কয়দিনের দুঃখ কষ্ট, চিন্তা উৎকণ্ঠা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তিনি শান্তিকে কাছে বসাইয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া স্নেহের আবেগে বিগলিত হইয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, বড় কষ্ট পেয়েছ—কি করব মা, তোমাকে সেই কষ্ট থেকে উদ্ধার করে আনতে

পারিনি বলে তোমার এই বুড়োছেলেটীর প্রাণে যে বেজেছে তা যদি দেখতে পেতে, তা হলে হয় ত মা তুমি নিজের কষ্টটাও ভুলে যেতে। আমি কিছু করতে পারিনি মা—ভগবান্‌কে দুঃখ জানিয়ে ছিলেম, তিনিই দয়া করে রক্ষে করেছেন।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সোণায় সোহাগা

কৈলাসচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলে, সেদিন রাত্রে গ্রামের অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শান্তির বিবাহ ভাগ্যচক্রে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং গোবর্দ্ধন তাহাকে নিজেই ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছে সেই সুসংবাদের জন্য সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরিচরণ বাবু বলিলেন, "শুনেছেন ত? রেবতীকান্ত কাল গোবর্দ্ধনকে শাসিয়ে গিয়েছে, সে কেমন করে সেই বর-ফিরে-যাওয়া মেয়ের বিয়ে দেয় তা দেখবে। সেই ভয়েই গোবর্দ্ধন আজ মেয়েটীকে বিদেয় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে মেয়েটীর যদি রমেশের সঙ্গে বিয়ে দেন, তাই নিয়ে রেবতীকান্ত গ্রামে একটা দলাদলি না বাধায়।"

কৈলাসচন্দ্র উত্তর দিালন, "তা বলে ত আমি মা লক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে পারি না। রমেশের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে বিয়ে আমি শীগ্‌গিরই দেব, যাতে আর কেউ মাকে আমার কেড়ে নিয়ে যেতে না পারে।"

হরিচরণ বলিলেন, "আপনি মহতেরই মত কথা বলেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে এই যে, পাছে আপনার কন্যাটীর পাত্র খোঁজবার সময় ওরা এই রকম একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করে—বিয়েতে ভাঙ্‌চি দেয়।"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "সেই কথাই বাড়ীর ভিতর হচ্ছিল;

একটী পাত্র মনে মনে ঠিক করে রেখেছি—সেখানে যদি হয় তা হলে বোধ হয় এ রকম অন্যায় ভাঙ্‌চি দিলে কোন ক্ষতি হবে না, তাঁরা এসব কথা শুনে বিয়ে ভেঙ্গে দেবার লোক নন। তবে আমার বেটীর যদি ভাগ্যে থাকে ত তেমন সুপাত্রে পড়বে। পাত্রটীকে আপনারা দেখেছেন—সেই বসন্তের কথাই বলছি; ছেলেটীর সঙ্গে আমার রমেশের কি রকম হরিহর-আত্মা তা জানেন ত। ছেলেটীর পিতাও খুব সজ্জন। তবে রীতিমত ধনী বড় লোক, সেইজন্য কথাটা পাড়তে সাহস হয়নি। এখন আর বিলম্ব করলে চল্‌বে না, তাই শীঘ্রই বসন্তের পিতার মত জানতে পাঠাব।”

হরিচরণ বলিল, “তা যদি হয় তা হলে ত কোন কথাই নাই, যথার্থ রূপে গুণে, ধনে মানে সুপাত্র বটে। কিন্তু আপনার কন্যাও যোগ্যা পাত্রী, আর আপনিও ত সাধ্যমত ব্যয় কর্‌তে ক্রটী করবেন না—তখন এ সম্বন্ধ না হবার কারণ দেখি না। যা হ’ক যত শীগ্‌গির হয়, যাতে বৈশাখের গোড়াতেই পুত্রের আর কন্যার দুজনেরই বিয়ে হয় তার চেষ্টা করুন।”

সেই পরামর্শ অনুযায়ী রমেশ পরদিনই কলিকাতায় যাত্রা করিল এবং সন্ধ্যার পর বসন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং বসন্তের জননীর সানন্দ অনুমতি লইয়া গৌরমোহন বাবুর নিকট বসন্তের সহিত সুধার বিবাহের প্রস্তাব করিল। গৌর-মোহন বাবুর পত্নী যেরূপ রমেশকে পুত্রের মত ভালবাসিতেন, গৌরমোহন বাবু নিজেও সেইরূপ রমেশকে যথেষ্ট স্নেহ করি-

তেন। তিনি পূর্ব্বদিন রাত্রে বসন্তের মুখে শান্তিকে পুনঃ-প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই বিপদের সময় রমেশের পিতা মাতার স্নেহময় ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। তিনি রমেশকে বলিলেন, "বাবা, আগে আগে আমার পরিবারের ও কন্যাদের মুখে তোমার ভগ্নীর অনেক গুণের কথা শুনতুম—অবশ্য বসন্তের মুখে সুখ্যাতি শুনেই তাঁরা সে সব কথা বল্‌তেন। তাতে দু-তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার আবার স্ত্রীর সাধ হয় যে, তোমার ভগ্নীর সঙ্গে তিনি বসন্তের বিয়ে দেন। কিন্তু বসন্ত তখন পঠদ্দশায় বলে আমি সে কথায় তখন প্রশ্রয় দিই নি। কিন্তু সে কথাটা ভুলিনি। তারপর বসন্তের কত জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে—কিন্তু তোমার ভগ্নীর কথাটা মনে ছিল বলে আমি কোন সম্বন্ধই গ্রাহ্য করিনি। তবে তোমাদের যে সে কথা বলিনি তারও একটা কারণ ছিল।"

রমেশ বলিল, "আমাদেরও অনেক দিন থেকেই কথাটা আপনাকে জানাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনি কি মনে কর্‌বেন ভেবে বলতে সাহস করিনি।"

গৌরমোহন বাবু বলিলেন, "এতে আর লজ্জা কি বাবা! জাত্যংশে যখন বাধছে না—তোমরা কুলীন আর আমরা সম্মৌলিক কায়স্থ, সদ্বংশ; তখন বল্‌লেই পারতে। আমি বলিনি,

যদি তোমরা আর কোথাও আগে থেকে কথা দিয়ে রেখে থাক।"

রমেশ বলিল, "না সে সব কিছু নেই—তবে আমাদের অবস্থা ত আপনাদের সমকক্ষ নয়, আর আপনাদের যোগ্য খরচপত্র করেন তেমন ক্ষমতাও বাবার নেই—"

গৌরমোহন বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "ছি ছি, ওসব কথা গুলো আমার কাছে বলো না বাবা। তোমার পিতা শুনেছি একজন মহাশয় ব্যক্তি—তোমাদের লক্ষ্মীর সংসার, এতে আবার ছোট বড় কি? আর দেনা পাঁওনার কথাই বা কেন? আমি রবিবার দিন গিয়ে, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে ত কন্যাটীকে দেখে একেবারে আশীর্ব্বাদ করে আসব।"

সেই কথামত পরবর্ত্তী রবিবার গৌরমোহন বাবু তাঁহার একজন বন্ধু ও একটী জামাতাকে সঙ্গে লইয়া রমেশের সঙ্গে তাহাদের দেশে গিয়া সুধাকে একেবারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৈলাসচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে তিনি যথার্থই আপ্যায়িত হইলেন। সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, "বৌমা আমার সর্ব্ব সুলক্ষণা, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।" পরে যখন গ্রামের লোকদের সহিত আলাপ করিয়া কথায় বার্ত্তায় শান্তির বিবাহ লইয়া দলাদলি হইবার আশঙ্কার কথা শুনিলেন, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ ত, আগে না হয় আমার পুত্রেরই বিবাহ দিই—তারপর বৈবাহিক মহাশয় যদি একঘরে হন, ওঁর সঙ্গে একঘরে হয়েই না হয় থাকা যাবে—কি বলেন মহাশয়?"

এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া হরিচরণ বাবু উত্তর দিলেন, "আমরা বল্‌তে সাহস করছিলুম না—কৈলাস বাবুর কন্যাটির বিবাহ আগে যদি হয়, তা'হলে খুবই ভাল হয়। কৈলাস বাবু নিরীহ লোক—আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে দলাদলির সম্ভাবনাটাও কম হয়ে যায়।"

গৌরমোহন বাবু সে প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। স্থির হইল বৈশাখের ৩রা সুধার বিবাহ হইবে এবং ১০ই রমেশের বিবাহ হইবে।

সুধার বিবাহে কৈলাসচন্দ্র সাধ্যমত ব্যয় করিলেন। কিন্তু গৌরমোহন বাবু পুত্রের বিবাহে কলিকাতার বড়লোকদের পন্থা অবলম্বন করিয়া আপনার ধনৈশ্বর্য্যের অপব্যবহার করিলেন না। পাছে ব্যয় বাহুল্য করিয়া গাত্রহরিদ্রা পাঠাইলে, অথবা বহুসংখ্যক বরযাত্রী আনিলে,কৈলাসচন্দ্র চক্ষুলজ্জার বিপাকে পড়িয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হয়েন, সেই আশঙ্কায় গৌরমোহন বাবু যথাসম্ভব জাঁকজমক পরিহার করিলেন এবং কৈলাসচন্দ্রের সমস্ত আয়োজনই তিনি পরম সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিলেন ও ভূয়োভূয়ঃ সুখ্যাতি করিয়া নিজের সুবিবেচনা ও সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। কিন্তু নিজের বাটীতে তাঁহার নববধূমাতাকে লইয়া গিয়া গৌরমোহন বাবু পাকস্পর্শের দিন আপনার অবস্থানুযায়ী সমারোহ করিলেন। সে দিন তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া যোগমায়া ও শান্তিকে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে লইয়া গেলেন। শান্তির মনে যে দারুণ আঘাত

লাগিয়াছিল, তাহা হইতে তখনও সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; সুধার বিবাহের কয়দিন মনে হইয়াছিল বুঝিবা শান্তি তাহার পূর্ব্ব প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইয়াছে, কিন্তু বরকন্যা বিদায়ের দিন হইতে শান্তির মুখ পুনরায় মলিন হইয়া গেল। সুধার সহিত দেখা হইলে শান্তি আহ্লাদিতা হইবে ভাবিয়া যোগমায়া শান্তিকে লইয়া নূতন কুটুম্ব বাটীতে যাইলেন, নতুবা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে বিবাহের পূর্ব্বে তিনি শান্তিকে বাটীর বাহিরে পদার্পণ করিতে দেন। তাঁহাদের আগমনে গৌরমোহন বাবু ও তাঁহার পত্নী যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। প্রভাবতী প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া নিতান্ত পরিচিতা ও পরমাত্মীয়ার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শান্তিকে দেখিয়া প্রভাবতী যোগমায়াকে বলিলেন, "অনেক দিন থেকে বসনের মুখে তোমার শান্তির কথা শুনে আস্‌ছি—কিন্তু আজ মেয়েটীকে দেখে চোখ জুড়াল, মুখের এমন শ্রী—এমন লক্ষ্মী লক্ষ্মী ভাব খুব কম দেখা যায়, একটু রোগা, তা হোক, গড়নটী নিখুঁত—যেন মোমে ঢালা। কিন্তু সে যা হোক দিদি, তুমি যে বরের মা হয়ে আবার বিয়ের সময় ক'নের মাও হবে, তা হতে দিচ্ছিনি—আমি গিয়ে তোমার শান্তির বিয়ে দেব।"

যোগমায়া বলিলেন, "তোমারই ত সব বোন্—রমেশও তোমার, শান্তিও তোমার; তুমি নিজের ঘরে যাবে তার আর কথা কি দিদি? সে আমার ভাগ্যের কথা।"

প্রভাবতী বলিলেন, "ওসব ভাগ্যের টাগ্যের কথা বল্লে

রাগ করব দিদি, ছোট বোন্‌কে ওকথা বলে লজ্জা দিও না। সে যাক, বল্‌ছিলুম কি, শান্তির মাসীর এসেই বিবাহ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যে ব্যবহার করেছেন—তা তিনিই করুন আর তাঁর স্বামীই করুন—অতি বড় শত্রুও তেমন ব্যবহার করে না। তাঁকে ত আর আন্‌তে পার্‌বে না। তাই আমি বসনের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তাকে বলে কয়ে রেখেছি—আমি শান্তিদের বাড়ীতে গিয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে আসব। কর্ত্তা সে কথা শুনে কত আহ্লাদ কর্ত্তে লাগলেন—তিনি বলেছেন সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার অপেক্ষা ছিল।”

যোগমায়া অপ্রত্যাশিত স্নেহের নিদর্শনে বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, “তোমার কথা শুনে বোন্ আমার মনে যে কি হচ্ছে তা আর কথায় কি করে বুঝাব? বাছা আমার মা বাপের আদরের মেয়ে ছিল, ওকে যে তুমি দয়া করে মেয়ে ব’লে বিয়ে দিতে চাচ্ছ তাতে আমি আর তোমায় কি বল্‌ব বোন্‌—হরি তোমার ভাল করবেন, তোমার এই রাজার সংসার আরও উথ্‌লে উঠবে।”

প্রভাবতী আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভালবাসিতেন না, তিনি সেই প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিলেন, “তবে আসল কথাটা বলে ফেলি দিদি; এটী হলো আমার বৌমাটির জন্যে—আমার এই বৌমাটীকে পেয়ে আমি যে কি সুখী হয়েছি তা আর কি বলবো—সেই সুখেই আমার মনে এখন নানারকম সাধ

উঠছে, শান্তির বিয়ে দেবার সাধটা বোধ হয় সেই জন্যে মনে এসেছে। বৌমা আমার রূপেও ঘর আলো করছেন—আর এর মধ্যেই চালচলন বুদ্ধি বিবেচনাও যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে খুবই ভাল হবেন বলে বোধ হচ্ছে। তোমারই ত মেয়ে দিদি, ভাল না হয়ে যাবে কোথা?"

সুধার প্রশংসা শুনিয়া যোগমায়া মনে মনে যার-পর-নাই সুখী হইলেন। কিন্তু নিজের সুখ্যাতিতে তিনিও সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন, "নিজে ভাল হলে সবই ভাল হয় বোন্, তুমি নিজে ভাল, তাই সকলের ভালর দিক্‌টাই দেখ। সুধা আমার ছেলেমানুষ, ভুল-চুক্ দোষ-ক্রটী হবেই—তুমি সে সব সুধ্‌রে দিয়ে নিজের মনের মত করে গড়ে নেবে দিদি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় সময় কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, কেহ বুঝিতে পারিলেন না। অপরাহ্নকালে পাতা সাজান হইলে প্রভাবতী, শান্তি ও যোগমায়াকে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া যোগমায়া বৈবাহিক-বাটীতে আহারাদি করিতে আপত্তি করিলেন—বলিলেন, "আমি কি করে জামাইবাড়ী খেতে বসি বোন্—নাতি হলে এসে খেয়ে যাবো।"

প্রভাবতী কৃত্রিম অভিমান করিয়া বলিলেন, "তা হলে তোমার নাতিই হ'ল আপনার—আমরা সব পর, জামাই ত আর খাওয়াচ্ছে না—খাওয়াচ্ছি আমরা, তাতে যদি না খাও, তা হলে কিন্তু মনে সত্যি সত্যিই বড় কষ্ট হবে দিদি।"

প্রভাবতী কিছুতেই ছাড়িলেন না, অগত্যা যোগমায়াও পংক্তিতে গিয়া বসিলেন।

ভূরিভোজনের আয়োজন দেখিয়া যোগমায়া অবাক্ হইয়া গেলেন। দুইখানা করিয়া পাতা এবং প্রায় পঞ্চাশখানা খুরি, সরা, ভাঁড় ও ডিসের শ্রেণী দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে বলিয়া ফেলিলেন, "এ কি ব্যাপার দিদি! এ রকম পাতা সাজান ত কোথাও দেখিনি—আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, আমাদের এ গোলকধাঁধায় এনে কেন লজ্জা দিলে দিদি, এর কোন্‌টা রেখে কোন্‌টায় হাত দিই?"

প্রভাবতী একটু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "মনে করো না দিদি, তোমাদের হকচকিয়ে দেব বলে এই সব অনাসৃষ্টি খাওয়ানর ঘটা করেছি। এটা এখন কল্‌কাতার বড়মানুষ মহলে একটা জাঁক দেখানর ফ্যাসান্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন বিয়ের টাকা নেওয়া, কোথাও কিছু নেই আলো বাজনা করে বর নিয়ে যাওয়া, তত্ত্বে দু'শ একশ লোক পাঠান—এও তেমনি একটা ব্যায়রামে দাঁড়িয়েছে। না কর্‌লে লোকে নিন্দা করে, আবার কর্‌লেও কুপথ দেখান হয়। যাঁদের অবস্থা খারাপ, তাঁরা এই রকম নকল কর্ত্তে গিয়ে মারা যান। কিন্তু কি কর্‌ব বোন্, পাঁচ যায়গায় এই রকম খেয়ে আস্‌ছি, নিজে না কর্‌লে নিন্দে হবে।"

যোগমায়া বলিলেন, "তা যেন হল, কিন্তু সত্যি সত্যিই বল্‌ছি, এত জিনিস ত মানুষে খেতে পারে না, এর ত সবই ফেলা যাবে দিদি।"

প্রভাবতী উত্তর দিলেন, "তোমার যা রুচি যায় খাও. আর সব ফেল্‌বার জন্যেই হয়েছে—ফেলা যাক্, এটা আমাদের কল্‌কাতার বাবুয়ানার জরিমানা ; এ পাপ শিখে গিয়ে যেন পাড়াগাঁয়ে নিয়ে ঢুকিও না।"

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে ভয় নেই দিদি, ইচ্ছে হলেও ক্ষমতায় কুলোবে না।"

রাত্রে থিয়েটার হইবার কথা ছিল, প্রভাবতী যোগমায়া ও শাস্তিকে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যোগমায়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পরের গাড়ীতে দেশে ফিরিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সামাজিক আনন্দ

বহির্বাটীতে কৈলাসচন্দ্রের নিকটেও গৌরমোহন বাবু, তাঁহার পত্নী যে শান্তির মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাহার বিবাহ দিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সে কথা বলিলেন। কৈলাস-চন্দ্রও বলিলেন, "সে ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।" গৌরমোহন বাবু বলিলেন, "আমি সপরিবারে গিয়ে পড়ছি, বিয়ের ২।১ দিন পূর্ব্বেই যেতে হবে।"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "নিজের ঘর ভেবেই যখন যাচ্ছেন, তখন যে দিন ইচ্ছে যাবেন—তবে আপনাদের কষ্ট হবে, এই যা ভাবনা। নইলে আপনি দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলে আমার যে কত ভরসা হবে, আমি যে কত সুখী হব তা বল্‌তে পারি না। আপনি অতি সদাশয় ব্যক্তি তাই এ রকম ইচ্ছা করেছেন, আপনার এ ঋণ আমি শুধ্‌তে পারব না।

গৌরমোহন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঋণ-টিনের কথা আপনার ভাব্‌বার দরকার হবে না—কারণ, আপনি এ ক্ষেত্রে ভাবী কুটুম্বের মতনই থাকবেন, আমরা হরনাথ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে বিবাহের উদ্যোগ—বন্দোবস্ত, ইচ্ছামত করে নেব, তাতে আপনি কোন কথা কইতে পাবেন না।"

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, "তা আপনার যে রকম অভিরুচি

সেই রকম কর্‌বেন, তবে আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বেন—শান্তির পিতার যৎসামান্য বিষয় সম্পত্তি থেকে যা কিছু আমি সঞ্চয় করতে পেরেছি, তা আপনার হাতে দিয়ে যাব—আপনি তাইতেই বিবাহের ব্যয় কোন রকমে সেরে নেবেন; এই অনুগ্রহের ওপর অন্যায় খরচপত্র করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।"

গৌরমোহন বলিলেন, "আপনি শান্তির জন্যে যা রেখেছেন তা দেবেন্‌, মাথা পেতে নেব; আর লোকদেখান অন্যায় ব্যয় করে আপনাকে কুণ্ঠিত করাও আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু আমার পরিবার যখন মেয়েটীকে নিজের মেয়ে ভেবেই বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তখন তিনি যদি কিছু খরচপত্র করে মনে সন্তোষ পান, সেটুকু থেকে আপনি তাঁকে বঞ্চিত কর্‌বেন না. আমারও আপনার কাছে এই অনুরোধ। আপনি যদি এই আনন্দটা অন্য ভাবে নেন তা হ'লে মনে কষ্ট হবে—এইটুকু শুধু আপনাকে বলে রাখলুম।"

কৈলাস বাবু লজ্জিত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়নম্র স্বরে উত্তর দিলেন, "না বেয়াই মশায়, আমি আর আপনাকে কিছুই বলতে চাই না—যে কটা কথা বলেছি তার বেয়াদবি মাফ্‌ করবেন। আপনি যেরূপ সুবিবেচক, সদাশয় ব্যক্তি, তখন আপনার এই দয়ার কাজে কোন কথা বলাই আমার ধৃষ্টতা মাত্র।"

গৌরমোহন বলিলেন, "ওকি কথা বলেন! আপনি যা

বলেছেন, মহতের মতই কথা বলেছেন, আমি আমার খেয়ালের কথাটা শুনিয়ে রাখলুম, পাছে আপনি কিছু মনে করেন। তবে আপনাকে কোন রকমে কুণ্ঠিত হতে দেখলে, আনন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে—সেই স্বার্থ চিন্তাতেই ও কথাগুলো বলেছি।”

সেই কথামত কৈলাসচন্দ্র শান্তির জন্য যে কয়েকখানি গহনা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং নগদ যাহা জমাইয়াছিলেন তাহা গৌরমোহন বাবুকে দিয়া বলিলেন, “এ গুলি আপনাদের পক্ষে যৎসামান্য, সর্ব্বসমেত হাজার দেড়েক টাকা হবে; কিন্তু এ গুলি সবই শান্তির নিজের। আমি মা লক্ষ্মীর গা'সাজান অলঙ্কার গড়াতে দিয়েছি, তা পরে দেব।”

বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে দাস-দাসী, দ্বারবান, পাচক, সরকার, আত্মীয় কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী গুছাইয়া লইয়া প্রভাবতী শান্তিদের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। বসন্তও সঙ্গে যাইল এবং কলিকাতা হইতে লোক-জন দিবারাত্র যাতায়াত করিতে লাগিল। গৌরমোহন বাবু বিবাহের গাত্রহরিদ্রার আয়োজন করিয়া কলিকাতা হইতে পাঠাইতে লাগিলেন। গাত্রহরিদ্রা যথানিয়মে, কিন্তু বিনা আড়ম্বরে, সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে গৌর-মোহন বাবু নিজে কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু সঙ্গে লইয়া হরিহরপুরে গেলেন। কলিকাতায় রমেশের এবং বসন্তের বন্ধুদের, কৈলাসচন্দ্রের বা হরনাথের পরিচিত ও আত্মীয় সকল-

কেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গৌরমোহন বাবুর বিশেষ ইচ্ছায় গোবর্দ্ধনও নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে নাই।

কৈলাসচন্দ্রের ও হরনাথের উভয় বাটীতেই নহবৎ বসিল। শান্তিদের বাটীর সম্মুখের পতিত জমি পরিষ্কৃত করিয়া সেখানে সুবৃহৎ সামিয়ানা খাটাইয়া ও কানাৎ দিয়া ঘিরিয়া ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং শান্তিদের পরিত্যক্ত উঠান পত্রপুষ্পে, চন্দ্রাতপে ও আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া নূতন শোভা ধারণ করিল। গ্রামের মধ্যে যাহারা রেবতীকান্তের প্ররোচনায় ইতঃপূর্ব্বে দলাদলি বাধাইবার আভাষ দিয়াছিল, তাহারাও কার্য্যকালে কৈলাসচন্দ্রের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিল না। গৌরমোহন বাবু কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ধনে ও মান্যে তাঁহার সহিত রেবতীকান্তের মত ক্ষুদ্র জমিদারের তুলনাই হইতে পারে না। গৌরমোহন বাবুর উপস্থিতিতে এবং তাঁহার বাটীতে সমারোহ ক্রিয়াকাণ্ডে সতত অভ্যস্ত ব্যক্তিগণের উপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের পরিচর্য্যার ভার পতিত হওয়াতে, সুশৃঙ্খলার সহিত বিবাহের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সকলেই আদর অভ্যর্থনায় এবং আহারাদির উৎকৃষ্ট আয়োজনে আপ্যায়িত হইয়া গৌরমোহন বাবুর সুবন্দোবস্তের সুখ্যাতি করিল।

বিবাহের দিন শ্যামাকে আনিতে গিয়া লোক ফিরিয়া আসিল। রেবতীকান্তের সামাজিক শাসনের ভয় উপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করাতে গোবর্দ্ধন কৈলাসচন্দ্রের

প্রতি যথার্থই প্রীত হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্তও হইয়াছিল। শ্যামাকে আসিতে দিতে গোবর্দ্ধনের অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু শ্যামা বলিল, "আমি আর কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে যাব, তুমি কি আর সে পথ রেখেছ ?" গোবর্দ্ধন নিজেও আসিতে সাহস করিল না, পাছে গ্রামের কোনও লোক কিছু বলে, কিন্তু তাহার এক পিতৃব্য-পুত্রকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইল এবং শান্তির জন্য এক-খানি বেনারসী কাপড় ও একছড়া মুক্তার মালা পাঠাইয়া দিল ; গোবর্দ্ধনের প্রেরিত সেই উপহার ও তত্ত্ব কৈলাসচন্দ্রের আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ ফেরৎ দিতে পরামর্শ দিল ' কিন্তু গৌরমোহন বাবু সে কথা শুনিলেন না. তিনি বলিলেন, "না না, তা কি হয় মশায়, মাসী যৌতুক দিয়েছে, সে তত্ত্ব কি ফেরত দিতে আছে! তাদের পাপের সাজা তাদের মনই তাদের দিচ্ছে। নেহাত বুদ্ধির দোষে ওরকম কাজ করেছিল বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

প্রভাবতী শান্তিকে নিজের কন্যার স্থানীয়া ভাবিয়াই বিবাহের সমস্ত শুভকার্য্য ও স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করিলেন। সেই বিবাহ-উৎসবের আনন্দে সুধার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রভাবতী তাহাকে শান্তিদের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া সে বধূজনোচিত লজ্জার দায়ে মনের আনন্দ অবাধে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। তাহার ননন্দাগণ তাহাকে 'বরের ঘরে মাসী আর ক'নের ঘরে পিসী'

কেই ি
১ ।। বিদ্রূপ করিয়া কৌতুক উপভোগ করিতেছিল। শান্তির চুল বাঁধিয়া দিতে বসিয়া একবার ক্ষণেকের জন্য সুধা তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়াছিল। শান্তির নববধূ বেশে সজ্জিত মুখের অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া মনের উল্লাসে তাহার চিবুক ধরিয়া সুধা তাহাকে আদর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ বসন্ত সেই গৃহে প্রবেশ করাতে সুধা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল। তাহার উপর বসন্ত তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া যাইতে ছাড়িল না—সে এদিক ওদিক্ চাহিয়া, আর কেহ নিকটে নাই দেখিয়া বলিয়া গেল, "বলি হচ্ছে কি? দাঁড়াও, রমেশকে গিয়ে বলে দিচ্ছি—এর মধ্যে দাদার ওপর বাটপাড়ি।" বসন্ত নিজেও কিন্তু বিদ্রূপের হাত এড়াইতে পারিল না, রাত্রে কোনও কার্য্যোপলক্ষে একবার বাসরগৃহে প্রবেশ করাতে, তাহার পিতামহীসম্পর্কীয়া জনৈক আত্মীয়া তাহাকে বলিলেন, "কি গো পালাও কেন? এ দিকে এস না, নাতবউ ত আর ভায়ের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করতে পারবে না—তুমিই না হয় বৌএর হয়ে একটু একৃটিন্ খাট—ভগ্নীপোত থেকে শালার ধাপে নাম।" বসন্ত উত্তর দিল, "এখন একৃটিন্ খাটবার ফুরসৎ নেই ছোট-ঠাকুরমা—নিজের কাজই সাম্‌লে উঠতে পারছি না।" এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বসন্ত সে স্থান হইতে পলাইয়া বর্ষীয়সী ছোট-ঠাকুরমার বাক্য-বাণ হইতে সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিল।

প্রভাবতী বিবাহের পরেও দুই দিন হরিহরপুরে থাকিয়া

যথাবিধি ফুলশয্যা পাঠাইলেন এবং ফুলশয্যা উপলক্ষে শান্তিকে ও রমেশকে বহুবিধ বসন ভূষণ সুগন্ধ ও বিলাস দ্রব্য পাঠাইলেন। তিনি শান্তিকে যৌতুকস্বরূপ কয়েকখানি মূল্যবান অলঙ্কারও দিয়াছিলেন। যোগমায়া তাহাতে সঙ্কুচিতা হইয়াও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণে কিছুই বলিতে পারিলেন না। প্রভাবতী শান্তিকে ফুলশয্যার পরদিন আপনার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গিয়া পরদিন পাঠাইয়া দিলেন। প্রভাবতীর ব্যবহারে গ্রামের প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল, কলিকাতার বড় মানুষের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গর্ব্বিতা ও সাংসারিক কর্ম্মে নিতান্তই অপটু। কিন্তু প্রভাবতীর নিরহঙ্কার, সদয় ব্যবহার, অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা ও গৃহিণীপনার সুশৃঙ্খলা দেখিয়া তাহারা সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ছিদ্রান্বেষী হরিশ ভট্টাচার্য্যের মাতাও এক দিন সিধা লইয়া গ্রামে গিয়া তাহার ভ্রাতৃজায়ার কাছে বলিয়াছিলেন, "ঘোষেদের গিন্নির বেয়ানের মত মানুষ দেখিনি। অত যে ধনদৌলত, রাজরাণী বল্লেও হয়; অন্য লোকে হলে মাটীতে পা পড়ত না—কিন্তু বাছা যেন মাটির মানুষ। যেমনি ঘোষেদের গিন্নি নিজে ভাল, বেয়ানও কি বিধাতা-পুরুষ তেমনি জুটিয়েছে! বল্লে না পিত্যয় যাবে বউ, আমি যখন গেলুম তখন বিয়ের ঝঞ্ঝাটে কি রকম ব্যতিব্যস্ত ছিল তা জান ত? কিন্তু রামের মা যেমন বল্লে, আবুই-মা ভট্টাচায্যি মশায়দের গিন্নি ঠাকরুণ এসেছেন—অমনি সব কর্ম্ম ছেড়ে এসে 'আসুন মা, বসুন'

বলে কি যে করবে, কোথায় বসাবে তা যেন ঠিক পেলে না। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি হাতও দরাজ; বাড়ীতে যে গেছে তাকেই দু হাত পূরে খাবার দিয়েছে।" এইরূপ প্রশংসা সকলের মুখে মুখে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। প্রভাবতীর সযত্ন ব্যবহারে শান্তিও এই কয়দিনেই তাঁহার নিতান্ত আপনার জনেরই মত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘটনায় সুধারও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহার শ্বশুরবাটী যাইবার কথা উঠিতেই সে শান্তিকে বলিল, "আমি কিন্তু এবার একলা যাব না, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে ভাই; তুমি ত আমার ননদ হয়েছ"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "বেশ ত যাব—তার আর কি?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তির অশান্তি

বিবাহের পর রমেশ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সুধাকেও মাসেক পরে প্রভাবতী লইয়া গেলেন; শান্তি এক্ষণে একক হওয়াতে সকলেই বুঝিতে পারিল তাহার মনে আর সে পূর্ব্ব-প্রফুল্লতা নাই। শান্তি যোগমায়ার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার গৃহস্থালী কর্ম্মে পূর্ব্বের মত সাহায্য করে এবং কাজে যখন ব্যস্ত থাকে তখন কেহ তাহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্যও করিতে পারে না কিন্তু অবসর কালে সে অন্যমনস্কা হইয়া যখন বসিয়া থাকে তখন তাহার মনের অবসাদ সকলেই বুঝিতে পারে। রামের মা একদিন তাহাকে ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বলিল, "অমন করে চুপ করে বসে আছ কেন খুকি? সাবিত্রীদের বাড়ীতে একটু বেড়িয়ে এস না?"

শান্তি বলিল, "কেন বুড়ীদিদি, কি হয়েছে? আমি ত বেশ আছি।" রামের মা কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট হইল না; সে আপনার মনে বলিতে লাগিল, "মেয়েটা দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্ছে।"

যোগমায়াও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, শান্তি দিন দিন শীর্ণা ও

মলিনা হইয়া যাইতেছে—তাহার মনের স্ফূর্ত্তি নাই শরীরেরও সে স্বাস্থ্য নাই। কৈলাসচন্দ্র আসিলে যোগমায়া তাঁহার মনের আশঙ্কার কথা বলিলেন, "জ্বরজাড়ি নেই অথচ শান্তি কেন যে দিন দিন অমন হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।"

কৈলাসচন্দ্র শান্তিকে কাছে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে সস্নেহ-বচনে জিজ্ঞাসা করিতেন, "মা, তোমার শরীর এমন কাহিল হয়ে যাচ্ছে কেন—কিছু অসুখ-টসুখ করেছে কি?"

শান্তি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কৃত্রিম প্রফুল্লতা দেখাইয়া উত্তর দিত, "কেন বাবা, আমি ত বেশ আছি—আপনি কিছু ভাববেন না। মা একটুতেই মনে করেন আমার অসুখ করেছে, তাই শুধু শুধু ভেবে ভেবে নিজের মন খারাপ করেন।" বিবাহের পর হইতে কৈলাসচন্দ্রকে 'বাবা' এবং যোগমায়াকে 'মা' বলিতে প্রভাবতী শান্তিকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। শান্তিও সেই উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে—প্রথম প্রথম তাহার বাধ বাধ ঠেকিত—দুই একবার পূর্ব্ব অভ্যাসের বলে 'জ্যেঠাইমা' 'জ্যেঠামশায়' বলিয়া ফেলিত; কিন্তু এক্ষণে সে অভ্যস্তা হইয়া গিয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণ কালে ছাদের উপর কাপড় তুলিতে গিয়া শান্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল। রামের মা সেখানে বসিয়াছিল, সে শান্তির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে খুকি, অমন করছ কেন?" শান্তি কোনও উত্তর দিতে পারিল না, কেবল 'নিস্তারিণী' কথাটা

তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল। রামের মা বলিল, "সেই নিস্তারিণী মাগীর মত কাকে রাস্তায় দেখেছ বুঝি? সে কি আর এ পাড়ায় আসে, এলেই বা ভয় কি? বাড়ীতে এলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব না!" শান্তি নিজের অকারণ ভীতিতে লজ্জিতা হইল, কিন্তু যোগমায়া তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া অধিকতর চিন্তিতা হইলেন।

মনের আতঙ্ক ব্যতীত একটা গভীর বেদনা শান্তির প্রাণে মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহার মাসীর বাটীতে সে যে 'দোপড়া' কথাটা শুনিয়া আসিয়াছিল, কৈলাসচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন সে কথা অগ্রাহ্য করিলেও শান্তি নিজে সে কথা ভুলিতে পারে নাই। রমেশকে সে দেবতার চক্ষে দেখিত এবং তাহার মনে হইত, সে কি আর এখন রমেশের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত আছে—শুভ্র নির্ম্মল পবিত্র কুসুমেই দেবতার পূজা হয়, সে যে এখন ধূলিধূসরিত ঝরা ফুল! বিধাতা কেন তাহার শুভ্র অঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্কের দাগ দিলেন! সে যে সেই মলিনতা লইয়া দেবতার অমর্য্যাদা করিতে বসিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শান্তি আপনার হীনতা ও দীনতার জন্য ভাগ্য-বিধাতার দোষ দিত এবং অপনাকে সকলের কৃপার পাত্রী ভাবিয়া সদাই ম্রিয়মানা থাকিত।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা শেষ হইলে রমেশ বাটী আসিল। সেই সময় বসন্তকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। যোগমায়া বসন্তের কাছে শান্তির মনের স্ফূর্ত্তির

অভাব ও স্বাস্থ্যহানির কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "মেয়েটা কেমন হয়ে যাচ্ছে, বল্লেই বলে বেশ আছি। কিন্তু দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—কি যে কর্‌ব তা ঠিক করতে পারছি না। কবিরাজ মশায় এসেছিলেন তিনি বল্লেন অসুখ কিছু নেই—আমার কিন্তু সে কথায় কেমন মন উঠছে না।"

শান্তি বসন্তের সম্মুখে বাহির হইত এবং আবশ্যক হইলে দুই একটা কথাও কহিত। বসন্ত শান্তিকে ডাকিয়া তাহার অসুস্থতার কারণ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সকল কথাতেই শান্তি অধোবদনে 'হাঁ' 'না' করিয়া শেষে মৃদু হাসিয়া, "আমি বেশ আছি, কেন আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন" বলিয়া চলিয়া গেল।

যোগমায়া বলিলেন, "শুনেছি হাওয়া বদ্‌লে আনলে শরীর সেরে যায়। তাই আমার বড় ইচ্ছে করে দিন কতক যদি শান্তিকে নিয়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারি তাহলে হয় ত মেয়েটা সেরে যায়।"

বসন্ত বলিল, "সে মন্দ কথা নয়—তাই করুন না?"

যোগমায়া বলিলেন, "এই ঘর-সংসার ফেলে কি করে যাই বাবা—সব সুবিধেও হয় না তাই কিছু ঠিক করতে পারিনি।"

বসন্ত রমেশকে অন্তরালে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই কর না হে ভায়া—হনিমুনটা বাকি থাকে কেন? আমাদের হরেন ডাক্তার পুরীতে সমুদ্রের ধারে একটা বাঙ্গলা করেছে, দু-এক মাসের জন্যে সেইখানে যাও না—মারও তীর্থ

হবে এখন—তোমারও হনিমুনটা হয়ে যাবে। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হবে।”

রমেশকে নিরুত্তর দেখিয়া বসন্ত পুনরায় বলিল, “না হে ঠাট্টা নয়—আমার বোধ হয় একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এলে ভাল হয়।”

রমেশ বলিল, “তুমি নিয়ে যাও না—আমি বাবাকে ও কথা বল্‌তে পারব না।”

বসন্ত বলিল, “পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ—কেন? আমিই না হয় বলাবলি কাজটার ভার নিচ্ছি।”

কৈলাসচন্দ্রের নিকট বসন্ত সেই কথার অবতারণা করিয়া বলিল, “আপনিও খেটে খেটে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, যান না, ছুটি নিয়ে দিন কতক জিরিয়ে আসুন না?”

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, “আমরা সেকেলে লোক বাবা, চেঞ্জটেঞ্জ্ বুঝি না, তবে তীর্থগুলো মাঝে মাঝে দেখে আসবার ইচ্ছে খুবই হয় কিন্তু কি করব, কাজের ঝঞ্ঝাটে পেরে উঠি না। কিন্তু মা লক্ষ্মীর জন্যে আমি সবই করতে পারি, যদি এতে উপকার হয়, তাই করতে হবে। আমি থাক্‌তে পারব না, ২।৪ দিন থেকে চলে আসব—রমেশের এখন ত পরীক্ষা হয়ে গেছে, সে-ই সঙ্গে থাকবে এখন।”

বসন্ত বলিল, “আমিও মধ্যে মধ্যে দু-একবার গিয়ে দেখে আস্‌তে পারব।”

তাহাই স্থির হইল। যোগমায়া, শান্তি, রামের মা, রমেশ,

কৈলাস বাবু সকলেই একত্রে যাইলেন। সুদর্শনের উপর বাড়ী রক্ষা করিবার ভার রহিল—বাড়ীতে আত্মীয়ারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রহিল এবং অপর দাস-দাসীরা রহিল। গ্রামের প্রতিবাসীরাও তাঁহাদের তত্ত্ব লইবার ভার লইলেন।

মাসেক কাল পুরীতে অবস্থান করিতে শান্তির পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। জগন্নাথের মন্দিরের বিরাট্ গাম্ভীর্য্য, বীচি-বিক্ষুব্ধ বিশাল বারিধির অবিরাম জলোচ্ছ্বাস এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পদরজানুলিপ্ত অগণ্য মন্দির মঠাদির পবিত্র মাহাত্ম্য অহরহঃ প্রত্যক্ষ দর্শনে শান্তির মনেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। শান্তি প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে পূজা ভোগাদি দেখিতে যাইত। স্থান-মহিমায় শান্তির স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় দেবভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তত্রাচ শান্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল না। অপরে তাহা লক্ষ্য না করিলেও রমেশ, তাহা দুই একটী ঘটনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। একদিন সন্ধ্যাকালে অতর্কিত ভাবে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ দেখে, পশ্চিমের দিগন্ত-সীমায় সাগরের ক্রোড়ে অস্তমান তপন যে মেঘমালার বর্ণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, শান্তি তন্ময় হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু শান্তির দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য-উপভোগের চিহ্নমাত্র নাই, সে দৃষ্টির উদাস করুণ ভাব লক্ষ্য করিয়া রমেশ শঙ্কিত হইয়া ডাকিল, "শান্তি, অমন করে কি দেখছ?" যেন দুঃস্বপ্নভঙ্গে চকিতা হইয়া শান্তি কিয়ৎক্ষণ

নির্ব্বাক্ থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "কই, কিছু না।" শান্তির সে উত্তরে রমেশ আশ্বস্ত হইল না।

আর একদিন রাত্রিকালে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া বর্ষণ আরম্ভ হইল। উন্মত্ত বারিধি বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া বেলা-ভূমিতে হাহাকারে আছাড় খাইতে লাগিল। সমুদ্র-সৈকতের সেই ক্ষুদ্র বাটিকা যেন এক মহাকায় দৈত্যের দীর্ঘশ্বাসে সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল শান্তি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল—বাত্যার শব্দে রমেশেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল—রমেশ শান্তিকে তদবস্থ দেখিয়া ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তি, অমন করম কেন? ভয় কি? সমুদ্রের ধারে একটু জোরে বাতাস হলেই এই রকম বেশী বলে বোধ হয়"

শান্তি কোনও উত্তর দিল না। রমেশ কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া বলিল, "শান্তি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক উত্তর দেবে?"

শান্তি ধীরে ধীরে বলিল, "কি কথা?"

রমেশ বলিল, "তুমি এখন মাঝে মাঝে অমন করে চেয়ে থাক কেন? আগে ত এমন ছিলে না! একটা কথা বলি—রাগ করো না—বিয়ে হয়ে তুমি কি সুখী হওনি?"

শান্তির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে চকিতা হইয়া বলিল, "ও আবার কি কথা?"

রমেশ বলিল, "আমার এক একবার মনে হয়—এখন

আর তুমি আমাদের আগেকার মতন আপনার ভাব না, যেন একটু দূরে দূরে থাক—তেমন প্রাণখুলে ভালবাস না! নইলে নিজে অত অসুখী হয়ে রয়েছ কেন?'

শান্তির চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, সে ব্যথিত স্বরে উত্তর দিল, "ছি ছি! ওসব কথা বলো না—মহাপাপ হবে—তোমাদের কাছে থেকে যদি সুখী না হই, তা হলে স্বর্গেও যে আমার সুখ নেই।"

রমেশ বলিল, "তবে অমন করে থাক কেন?"

শান্তি বলিতে পারিল না যে, সে নিজেকে রমেশের যোগ্য ভাবিতে পারে না বলিয়াই তার দুঃখ। সেই 'দোপড়া' কথাটা সে ভুলিতে পারিতেছে না বলিয়াই তাহার ভাবনা—সেই কলঙ্কের দাগটা আনিয়া সে রমেশের শুভ্র নির্ম্মল জীবনে লেপিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহার হৃদয়ের বেদনা তাহাকে কিছু-তেই সুস্থ হইতে দিতেছে না। কিন্তু সে কথা ভাবিতে সে নিজেই যে মরমে মরিয়া যায়—সে কথা কি আর কাহাকেও বলা যায়? সে কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিল "কি জানি, আমার কেমন ভয় হয়—তোমাদের অত আপনার হয়ে ছিলুম, সেই বুকের ভেতর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে আমায় কোথায় ফেলে দিচ্ছিল—সে কথা যখন মনে পড়ে তখন আর আমার জ্ঞান থাকে না, কিছুতেই ভরসা—বিশ্বাস থাকে না।"

রমেশ বলিল, "এখন আর ত তোমায় কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না শান্তি—তবে আর সে ভয় কেন?"

শান্তি বলিল, "সব বুঝি, কিন্তু মনের ভয়টা যে কিছুতেই যাচ্ছে না।"

রমেশ বলিল, "তুমি এত ভীরু, এত দুর্ব্বল কেন হলে শান্তি! মিছে ভয়ে নিজেও অসুখী হচ্ছ, আমাদেরও মনে কষ্ট দিচ্ছ।"

শান্তি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "সেইটেই ত ভাবনা আমি নিজের জন্যে ভাবি না, তোমাদের যে সুখী করতে পারছি না সেইটেই ত দুঃখ।"

শান্তিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রমেশ সস্মিতবদনে বলিল, "না গো গিন্নি—আমাদের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি নিজে আগেকার মত হেসে-খেলে বেড়ালেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

সে রাত্রে শান্তির সুনিদ্রা হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, সে যে রমেশকে বলিল, সে নিজের জন্য ভাবে না সে কথাটা কি ঠিক? সে ত নিজের ভয়—নিজের মন লইয়াই দিন রাত শশব্যস্ত হইয়াছে। মুখে সে বলে বটে সকলকে সুখী করাই তাহার ইচ্ছা, কিন্তু কাজে সে চেষ্টা করিবার জন্য তাহার মনকে সে অবসর দেয় কই? নিজের জন্য তাহার এত ভয়ই বা কেন? সে যদি আপনাকে বড় না করিয়া তুচ্ছ ভাবে তাহা হইলে কি তাহার ভয়ের ভাবনাটা যায় না? সে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; শেষ রাত্রে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আপদের শান্তি

একদিন প্রভাতে উঠিয়া শান্তি দেখে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, যোগমায়া রামের মাকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়াছেন ; পাচিকা দুধ জ্বাল দিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং উড়িয়া চাকরটী ঝাঁট দিতেছে। শান্তির শয্যা ত্যাগ করিতে কোনও দিন এত বেলা হয় না। সে কিছু লজ্জিতা এবং নিজের উপর অসন্তুষ্টা হইয়া বারাণ্ডার উপর হইতে দেখিতে লাগিল, যদি যোগমায়া সমুদ্রের কোন্ দিকে স্নান করিতে গিয়াছেন তাহা দেখিতে পায়। বারাণ্ডার উপর হইতে সমুদ্র-তীরের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। শান্তি দেখিল, তাহাদের বাটীর সম্মুখেই বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া রামের মা স্নানান্তে মাথা পুঁছিতেছে এবং যোগমায়া একটু দূরে—বোধ হয় সাগরের তরঙ্গে অবগাহন করিবার মানসে—বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছাস যোগ-মায়ার মস্তকের উপর আসিয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই যখন সেই জলরাশি অপসৃত হইল—শান্তি যোগমায়াকে সেখানে আর দেখিতে পাইল না, পরে দেখিল জলস্রোত যোগমায়াকে অনেক দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তিনি জলে পড়িয়া গিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। শান্তি ক্ষণেক কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত ভীতিবিহ্বলনেত্রে চাহিয়া

সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল ; পরক্ষণেই সে উন্মাদিনীর মত ঊর্দ্ধ-শ্বাসে সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটিল। সে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, বালুকায় তাহার পদদ্বয় প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উঠিয়া পড়িয়া পুনরায় ছুটিতে লাগিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন সমুদ্রের জলরেখার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, তখন যোগমায়াকে জলস্রোতে টানিয়া আরো দূরে লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে—রামের মা "ওগো কি সর্ব্বনাশ হলো গো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে—তীরে কয়েকজন স্নানার্থীনী উৎকলরমণী এবং বাঙ্গালী স্ত্রীলোক এবং দুই তিনজন প্রৌঢ়বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও দাঁড়াইয়া ভীতিপূর্ণনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। কিন্তু কেহই সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে নামিতে সাহস করিতেছে না। নিকটে কোনও 'জেলেডিঙ্গি' নাই, দূর হইতে দুইজন মৎস্যজীবী ছুটিয়া আসিতেছে—কিন্তু তাহারা অনেক দূরে। আর একটা ঢেউ আসিলেই বোধ হয় যোগমায়ার দেহের কোন চিহ্নই দেখা যাইবে না। শান্তি কোনও দিকে না চাহিয়া অপসারিত ঊর্ম্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়াকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে সাগরের তরঙ্গপ্রাকার কল্লোলিত হইয়া আসিল। রামের মা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল—"খুকি চলে আয়—চলে আয়!" তীরে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল—তাহারাও ব্যাকুল হইয়া বলিল, "আর যেওনা, ডুবে যাবে!" শান্তি সে নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত

করিল না। সে সাগরের ঢেউ কাটাইবার উপায় দেখিয়াছিল —সেই উপায়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া আনত দেহে দাঁড়াইয়া উত্থিত তরঙ্গের বেগ প্রতিহত করিয়া পুনরায় অপসৃত জলরাশির পশ্চাৎদ্ধাবন করিল। তীর হইতে শব্দ উঠিল, "এইবার মেয়েটা গেল।" শান্তির পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল, কিন্তু সে সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া তাহার লক্ষ্যের দিগে অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে শান্তি যখন যোগমায়ার সংজ্ঞাশূন্য দেহ সাপটিয়া ধরিল তখন সে আকণ্ঠগভীর জলে নামিয়া গিয়াছে—এইবার জলোচ্ছ্বাসে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে তাহার ফিরিয়া আসা অসম্ভব। সেই শঙ্কটের সময় শান্তিকে যেন দৈববলে রক্ষা করিল—তরঙ্গের বেগে সে কয়েক হস্ত তীরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু সে যোগমায়াকে প্রাণপনে ধরিয়া রহিল এবং পলকে উঠিয়া অপগত জলস্রোতের টান হইতে আত্মরক্ষা করিল। এইরূপে সে যোগমায়ার দেহভার কখন বহন করিয়া, কখন টানিয়া লইয়া তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে অবসন্নপ্রায় হইয়া জানুমাত্র গভীর জলে আনিয়া ফেলিল। সেই সময়ে যে দুইজন মৎস্যজীবী দূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল তাহারা আসিয়া শান্তিকে ধরিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই শান্তি বিলুপ্ত-চেতনা হইয়া জলের উপর ঢলিয়া পড়িল। মৎস্যজীবিদ্বয় যোগমায়ার ও শান্তির সংজ্ঞাশূন্য দেহ জলরেখার উপরিভাগে সিকতাময় ভূমিতে বহন করিয়া লইয়া আসিল।

তখন তটভূমির উপর জনতা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। দূর হইতে একজন শুভ্রকেশ মিশনারী সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া কোট খুলিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছিল এবং অপর তিন চারিজন ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সাহেব তাহাদের সাহায্যে শান্তির ও যোগমায়ার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন লোক ডাক্তার ডাকিতে এবং অপর দুই তিনজন ব্যক্তি রমেশের অনুসন্ধান করিতে ছুটিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ও রমেশ আসিবার পূর্ব্বেই শান্তির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু যোগমায়া সমুদ্রের জল উদরস্থ করিয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া তাহা উদ্গার করাইবার এবং শ্বাসক্রিয়া পুনঃস্থাপনের জন্য সুব্যবস্থা করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল বাহুদ্বয় অবিরত সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচের পর যোগমায়ার স্বাভাবিক নিশ্বাস বহিল। তখন দুইখানি পাল্কী করিয়া শান্তি ও যোগমায়াকে রমেশ বাসায় লইয়া গেল। ডাক্তার, পাদ্রী সাহেব এবং তাঁহার সাহায্যকারিগণ সকলেই পাল্কীর অনুগমন করিলেন। ডাক্তারের সুচিকিৎসায়,—তাপ-সেক ও ঔষধাদির গুণে শান্তি অপেক্ষাকৃত সুস্থা হইলে এবং যোগমায়ার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে রমেশ সেই সমবেত ব্যক্তিগণকে জনে জনে ধন্যবাদ দিল এবং ধীবরদ্বয়কে এক একখানি গিনি পুরস্কারস্বরূপ দান করিল। বিদায় লইবার সময় সাহেবটীকে রমেশ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শুধিতে

পারিব না। আপনি না থাকিলে আজ আমি মাতৃহীন হইতাম; আমার স্ত্রীও বোধ হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যাইত।”

সাহেব আবেগ-ভরে রমেশের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, “আমি বেশী কিছু করি নাই, এরূপ স্থলে মনুষ্যমাত্রেরই যাহা করা উচিত তাহাই করিয়াছি মাত্র; বিশেষতঃ আমি একজন ধর্ম্মযাজক—বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের সাহায্য করাই আমার পেশা, সুতরাং আমাকে ধন্যবাদ দিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার মাতার প্রাণরক্ষার জন্য যদি কাহাকেও ধন্যবাদ দিতে চাও, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিও—তিনিই নিজের প্রাণভয় তুচ্ছ ভাবিয়া তোমার মাতাকে বাঁচাইয়াছেন। বাঙ্গালী বালিকার যে এত সাহস—ক্ষীণদেহে এত শক্তি থাকিতে পারে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই—আজ আমার একটা শিক্ষা হইল। তোমার স্ত্রী-সৌভাগ্য দেখিয়া আমি তোমাকে ধন্য জ্ঞান করি।” কয়েকদিন পূর্ব্বে রমেশ যে শান্তিকে ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ হওয়াতে রমেশ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ বিদায় গ্রহণ করিলেও ডাক্তার রমেশের অনুরোধে আর দুই ঘণ্টা কাল থাকিয়া যোগমায়ার শুশ্রূষাদি করিয়া বিদায় লইলেন। শান্তির জ্ঞান হইলে সে যোগমায়ার পাংশুবর্ণ ও মৃতবৎ দেহ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সে যোগমায়ার কাছে

আসিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু ডাক্তার সে দিন কিছুতেই তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে দিলেন না। পরদিন সে কাহারও কথা শুনিল না, যোগমায়ার পার্শে আসিয়া বসিয়া রহিল। তৃতীয় দিবসে যোগমায়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। শান্তি রমেশকে বলিল, "এইবার চল মাকে নিয়ে দেশে চাই, আর আমার এখানে একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা করছে না।" কিন্তু ডাক্তারের উপদেশে রমেশকে আরও তিন দিন পুরীতে থাকিতে হইল।

ইতঃপূর্ব্বে রমেশ পিতাকে ও বসন্তকে তারযোগে সংবাদ দিয়াছিল যে, যোগমায়া সাগরের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন; এখনও তিনি শয্যাগতা, কিন্তু এখন আর কোনও ভয়ের কারণ নাই; শান্তিরও জীবনের একটা 'ফাঁড়া' কাটিয়া গিয়াছে। পুরীধাম ত্যাগ করিবার দিন রমেশ তাঁহাদের পুনরায় টেলিগ্রাম করিয়া হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবার সময় জ্ঞাপন করিল এবং নিজস্ব কামরা ভাড়া করিয়া সকলকে লইয়া রমেশ জগন্নাথ-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইল। ষ্টেশনে কৈলাসচন্দ্র নিজে গিয়াছিলেন এবং বসন্তও লোক জন লইয়া উপস্থিত ছিল। বসন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া সকলকে আপনাদের বাটীতে লইয়া গেল। গৌরমোহন বাবু ও প্রভাবতী তাঁহাদের কয়েকদিন কলিকাতায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যোগমায়া দেশে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া, পরদিন গৌরমোহন

বাবু তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সুধাকেও তাঁহারা পীড়িতা মাতার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

যোগমায়ার সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় এক মাস লাগিল; গাত্রে 'লুন ফুটিয়া' তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন। শান্তি সপ্তাহেক কালের মধ্যেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল এবং সকলেই লক্ষ্য করিল, শান্তির সেই সদাই সশঙ্কিত ভাব চলিয়া গিয়াছে। সকল ভয়ের আদি কারণ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শান্তি ভয়কে জয় করিয়া ফেলিয়াছে!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তির সুখ

স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কার্য্যে শান্তির একটা অদম্য উৎসাহ আসিল। যোগমায়া সংসারে যে সমস্ত কর্ম্ম যেরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতেন, তাঁহার দুর্ব্বল অবস্থায় শান্তি সেই সমস্ত কর্ম্ম ঠিক সেইরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত ক্ষিপ্রতর হস্তে সমাধা করিতে লাগিল ; তাহার উপর সে যোগমায়ার সেবা-শুশ্রূষা এবং আত্মীয় প্রতিবেশী যাঁহারা প্রত্যহই যোগমায়াকে দেখিতে আসিতেন তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা সমস্তই সুচারুরূপে করিতে লাগিল। সুধা সকল কার্য্যেই শান্তির সঙ্গিনী থাকিত কিন্তু তাহাকে শান্তি অধিক কিছু করিতে দিত না—কোনও পরিশ্রমের কার্য্য করিতে যাইলে শান্তি তাহাকে বলিত, "তুমি দুদিনের জন্যে এসেছ, তোমাকে ভাই ওসব কিছু কর্‌তে হবে না। তুমি দাঁড়িয়ে দেখ না আমি এখনি সব করে ফেল্‌ছি।" যোগমায়া শান্তিকে সময়ে সময়ে বলিতেন, "মা, অত খেট না, শেষে একটা রোগে পড়বে—তা হলে সংসারই বা দেখবে কে আর আমাকেই বা দেখবে কে ?" শান্তি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিত, "মার এক কথা, রোগে পড়তে যাব কেন ? কাজ করলে আমি বেশ থাকি।"

শান্তি যে এখন 'বেশ' আছে তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না। সে যে এখন সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে না—তাহার

মনে যে একটা স্বচ্ছন্দভাব আসিয়াছে তাহা শান্তি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রীত হইয়াছিল। তাহার মনের স্ফূর্ত্তি নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছিল,—সাংসারিক কার্য্যে স্পৃহা, অনুগত ব্যক্তিগণের ক্লেশ লাঘব করিবার চেষ্টা সকলকে সুখী করিবার বাসনা সেই স্ফূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। অবশ্য সেই স্ফূর্ত্তির নিগূঢ় কারণ যে কি তাহা শান্তি নিজেই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই—অপর কেহও অনুমান করিতে পারে নাই।

পুরী যাইবার পূর্ব্বে শান্তি আপনাকে রমেশের অযোগ্যা, নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী, প্রিয়জনের কৃপার ও দুর্ভাবনার পাত্রী ভাবিয়া নিজের ভাগ্যের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে এত অপদার্থ হইয়াও তাহার মাতার অধিক যোগমায়ার অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়া নিজের জীবনকে সার্থক করিতে, পারিয়াছে সেই আনন্দে তাহার অন্তরাত্মা ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার জীবন অকস্মাৎ মধুময় হইয়া গিয়াছিল। সুপ্রসন্ন ভাগ্যদেবতার উপর ভক্তিমতি হইয়া শান্তি জগৎসংসারকে নূতন চক্ষে দেখিতেছিল এবং তাহার মনের সেই নবীন আনন্দের আস্বাদ সকলকে বিতরণ করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শান্তির হৃদয়ের সেই অদম্য আবেগ ও উচ্ছ্বাসের মহিমায় কৈলাসচন্দ্রের সংসারে সুখ শান্তির একটা নূতন হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল।

সুধা একদিন শান্তিকে বলিল, "শান্তি, একটা মজার কথা শুনেছ?"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "শান্তি কি! বৌ-দিদি বল্‌তে পার না।"

সুধা বলিল, "বৌ-দিদি বল্‌তে যাব কেন? তুমি কি আমায় বৌ দিদি বল? দুজনে শোধ-বোধ হয়ে গেছে—নইলে ননদগিরি করে তোমাকে মজাটা দেখাতুম।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "কি মজাটা দেখাতে?"

সুধা বলিল, "চুপটী করে ঘরে বসিয়ে রাখতুম—সকলের হাত থেকে কাজ টেনে নিয়ে দিনরাত্রি চরকি ঘুরে বেড়ান বের করে দিতুম।"

শান্তি বলিল, "না ভাই, তা হলে সত্যি সত্যিই জব্দ হয়ে যেতুম।"

সুধা হাসিয়া বলিল, "শুধু কি তাই। তা হলে এই যে গ্রামশুদ্ধ লোককে বশ করে ফেলেছ, সেটা আর হ'ত না। মা বাবা ত চিরকালই শান্তি বল্‌তে অজ্ঞান—আর দাদার কথা ছেড়ে দাও, তার ওপর…এই যে নন্দাই থেকে আরম্ভ করে দুলেদের হরের পিসী, ভট্টাচার্য্যি গিন্নি পর্য্যন্ত সবাই যে দেশশুদ্ধ লোকের কাছে তোমার গুণ গেয়ে বেড়াচ্ছে—সেটা কি করে হ'ত তা দেখতুম।"

শান্তি বলিল, "সে ভাই তাঁরা সব আমায় ভালবাসেন

বলে অমন করেন, নইলে আমি আর কি করি যে তাঁরা আমার গুণ গাইবেন ?"

সুধা বলিল, "কি করেছ ? লোকে বাড়ীতে এলে তাদের বসতে জায়গা দিয়ে, ঘরে যা শাকপাত খাবার-দাবার থাকবে, তার কিছু দিয়ে, মিষ্টি কথা বলে তাদের কি বশটাই না করেছ—মাকে হারিয়ে দিয়েছ। আবার রামের মার আর সুদর্শনের ত বাড়ীর ভেতরের কাজগুলো সব নিজেই করছ— তা ছাড়া আমি যে এমন ননদ আমাকেই জবুস্থবু করে দিয়েছ —যা করতে যাই তাই দেখি আগে থেকে করে রেখেছ ?"

শান্তি বলিল, "আমি ত বলেছি ভাই, এই কাজে ব্যস্ত থেকে আমি নিজে বেঁচে গেলুম—নিজের মনের সব ভয় ভাবনাগুলো নিয়ে কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম দেখেছিলে ত ? এই কাজ গুলোই আমাকে বাঁচিয়ে দিলে।"

সুধা গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি শান্তি তোমার অত ভয় —আর কি করে যে তুমি সেই ঢেউ ভেঙ্গে মাকে তুলতে গেছ্‌লে তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি। ভয় হলো না ?"

শান্তি বলিল, "তখন কি আর ভয় টয়ের কথা মনে ছিল —মাকে সেই রকম জলে হাবুডুবু খেতে দেখলে, তুমিও গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।"

সুধা বলিল, "তা ভাই ঠিক্ বল্‌তে পারি না—তোমার মতন আমার অত ভয়টয় নেই বটে কিন্তু—"

শান্তি বাধা দিয়া বলিল, "আমার কি আর আগেকার মত ভয় আছে না কি মনে কর? জগন্নাথ আমার সে ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছেন।"

সুধা হাসিয়া বলিল, "ভয় গিয়েছে? যদি সেই নিস্তারিণী সম্মুখে এসে দাঁড়ায়?"

শান্তিও হাসিয়া বলিল, "এখন দেখতে পেলে, তাকেও চাই কি একপাত লুচী সন্দেশ খাইয়ে দিতে পারি।"

সুধা বলিল, "সত্যি? তা হলে তুমি দেবতা হয়ে গেছ বল—আমার ত এখনো সে মাগির কথা মনে হলে ভয় হয় না বটে, কিন্তু পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে যায়।"

শান্তি বলিল, "সে কথা থাক। এখন কি মজার কথা বল্‌বে বল্‌ছিলে, সেইটে শুনি।"

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার নন্দাই, দাদার কাছে বল্‌ছিলেন, তোমাকে একটা মেডেল দেওয়া উচিত—অন্য কোথাও হলে, দেশের লোকে মিলে তোমায় না কি মেডেল দিত।"

শান্তি বলিল, "শোন কথা! আমি আমার মাকে ধরতে গেলুম, তা দেশের লোকের কি মাথা ব্যথা পড়ে গেল যে আমাকে মেডেল দেবে?"

সুধা বলিল, "দাদা বল্লেন, 'মেডেল-টেডেল দেওয়া ত আমাদের পাড়াগাঁয়ে চলিত নেই, তোমরা সহুরে লোক, তুমিই না হয় মেডেলটা দিও।' তাতে উত্তর হলো—'মনে

কর তাতে কি শর্ম্মা পেছপাও না কি? সত্যি সত্যি আমিই একটা মেডেল দেব।' দাদা বল্লেন, 'তা বেশ ত দিও না—যথালাভ।"

শান্তি বলিল, "ওমা! সে কথা কি করে বল্লেন?"

সুধা বলিল, "কেন, দাদা কি অন্যায় বলেছেন?"

শান্তি বলিল, "অন্যায় না? ঠাকুর জামাই বলে করে পুরীতে না পাঠালে ত আর আমার সে ভয় ভাঙ্গতো না—আমি ত মিথ্যে হয়ে গিয়েছিলুম। কোথায় আমাকে রক্ষা করলেন বলে তাঁরই মেডেল পাবার কথা—না উল্টো দাবী—তাঁর কাছ থেকে মেডেল চাওয়া?"

সুধা বলিল, "তা দাদা ত আর মেডেল দিলেন না, তুমিই না হয় নন্‌দাইকে একটা মেডেল দিও না?"

শান্তি বলিল, "আমি আর কোথা পাব ভাই—আমার ত যে মেডেলটা ছিল সেটা ত আগে থাকতে তাঁকে দিয়ে দিয়েছি—সে মেডেলের কাছে কি আর সোণা রূপোর মেডেল মানাবে—সে যে সাত রাজার ধন—মাণিক।"

সুধা হাসিয়া বলিল, "ওমা সত্যি, নাকি? আমি ত সে মেডেল দেখি নি!"

শান্তি বলিল, "দেখনি! সে কি? অষ্টপ্রহর সেই মেডেল গলায় পরে থাকবার জন্যে ঠাকুর জামাই হাঁকুপাঁকু করে বেড়াচ্ছেন, আর তুমি দেখ নি?"

সুধা বলিল, "কৈ না! দেখিনি ত?"

শান্তি বলিল, "আচ্ছা দেখাচ্ছি" এই কথা বলিয়া একখানি দর্পণ আনিয়া সুধার সম্মুখে লইয়া গিয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া স্নেহভরে বলিল, "দেখ নি, এই দেখ।"

সুধা হাসিয়া বলিল, "সং আর কি!"

সেই সময়ে হঠাৎ রমেশ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্তি ও সুধার পরিহাসরসিকা মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তির নয়নে রহস্যের বিদ্যুৎ খেলিতেছে —ফুল্লাননে সুধার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া শান্তির স্বভাবতঃ লাজনম্রা লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিকে ভুবন-মোহিনী করিয়া তুলিয়াছে! পুরী যাইবার পূর্ব্বে ও পুরীতে অবস্থান কালে শান্তির মুখে যে বিষাদের কালিমা এবং তাহার উদাস দৃষ্টিতে যে আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া রমেশ শান্তির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা অকস্মাৎ মনে হইল। সেই শান্তি পুরী হইতে আসিয়া কি সুখ-সন্তোষ-আনন্দের উৎস শত মুখে উৎসারিত করিতেছিল তাহা কয়েক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া রমেশের হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। শান্তির সেই অপূর্ব্ব শ্রী প্রত্যক্ষ করিয়া রমেশ আপনার মনের আনন্দ গোপন রাখিতে পারিল না— তাহার মুখাবয়বে ভাগ্য-দেবতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। শান্তিও চকিত দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিতেই তাহার মনোভাব জানিতে পারিল এবং সে যে রমেশের মনে সেই সুখের উন্মেষ করিতে পারিয়াছে তাহা

ভাবিয়া আপনাকে ধন্যা এবং তাহার নারী-জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিল।

শান্তি ও সুধার সেই নিভৃত রহস্যালাপে ব্যাঘাত ঘটাইয়া অপ্রতিভ হইয়া সঙ্কোচ ভঙ্গ করিবার জন্য রমেশ সুধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি—অত হাসি কিসের ?"

সুধা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিছু না—শান্তি কারুর মেডেল্ নেবে না।" এই কথা বলিয়াই হাসিতে হাসিতে সুধা সেই গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইল।

রমেশ শান্তির সলজ্জ মৌন মূর্ত্তির দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলিল, "নিজে না নাও মেডেলটা আমাকেই না হয় দিও।"

শান্তির নয়নকোণে তখনও রহস্যের তড়িৎ খেলিতেছিল, সে বলিল, "পরের জিনিস তোমাকে দিতে গেলুম কেন ? আমার নিজের যথাসর্ব্বস্ব ত না চাইতেই দিয়ে দিয়েছি—তাতেও কি মন উঠছে না ?" এই কথা বলিয়া, রমেশকে সে পরিহাস পরিপাক করিবার অবসর না দিয়াই, শান্তি ত্বরিতপদে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "পালাও কেন ? শোন না।"

শান্তি ভ্রূভঙ্গি করিয়া উত্তর দিল, "এখন ফুরসৎ নেই।" পরে আনতবদনে ধীরে ধীরে বলিল, "বুড়দিদির ভাইপো ভাইঝিরা এসেছে তাদের খাওয়া দাওয়ার কি হচ্ছে দেখিগে ; মার গায়ে তেল মালিস করবার সময়ও হয়ে এল।"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা, একটা কথা শুনে যাও।"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "তোমার ত একটা কথা—তার কি আজ শেষ হবে ?"

রমেশ বলিল, "সাধে কি শেষ হয় না—আশ মেটে না যে।"

শান্তি বলিল, 'বেশ ত আশার আশায়ই থাক না ? আশ মিটলেই ত ফুরিয়ে গেল। সত্যি, এখন চল্লুম—কে এসে পড়বে"—এই কথা বলিয়া শান্তি রমেশের দিকে মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া, সলজ্জভাবে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। রমেশের মনে হইল, সেই দৃষ্টিতে শান্তির হৃদয়ভরা ভালবাসা যেন পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সুখ ষোলকলায় পরিপূর্ণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে রমেশ বাহিরে যাইবার সময় দেখিল রামের মার ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতৃ-কন্যাগণ ভোজন করিতে বসিয়াছে —শান্তি তাহাদের পরিবেশন করিতেছে। শান্তির আর তখন সেই রহস্য-চপলা মূর্ত্তি নাই—সে তখন বিগলিত-করুণা, ধীরা, আনন্দময়ী—যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা !

রমেশ শান্তির সেই মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইল।

সমাপ্ত